# বধ্যভূমির উৎসব

আহমদ ফারাযের উর্দু কবিতা



# বধ্যভূমির উৎসব

## আহমদ ফারাযের উর্দু কবিতা

চয়ন, ভাষান্তর ও ভূমিকা

জাভেদ হুসেন

বধ্যভূমির উৎসব
আহমদ ফারায়ের উর্দু কবিতা
চয়ন, ভাষান্তর ও ভূমিকা : জাভেদ হুসেন

কুঁড়েঘর, ফাল্গুন ১৪১৫, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজ কারিগর
বর্ণবিন্যাস : কালজয়ী কম্পিউটার্স

Bodhyobhumir Utsab
Urdu Poems of Ahmed Faraz

Selection, Translation and
Introduction by Javed Hussen

Published by Kureghar
February 2009
Dhaka, Bangladesh
e-mail: kureghar08@gmail.com

Cover: Mustafiz Karigor
Compose: Kaljoyee Computers

Price: 2 USD
মূল্য : ১০০ টাকা

# সূ ত্র পা ত

*(১)*

*আহমদ ফারাযের* কবিতার এই সঙ্কলনের নাম দেয়া হল *বধ্যভূমির* উৎসব, উর্দুতে *জশনে মকতল*। এটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ বা সঙ্কলনের নাম নয়, তাঁর একটি গজলের একটি শেরের দুটি শব্দ। গজলটি এই সঙ্কলনে মওজুদ আছে। এরকম রেওয়াজ উর্দু সাহিত্যেই আছে। *গালিবের* কাব্য জগতকে নতুন মানে দিয়েছে *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের* যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ, তার নাম *নকশে ফরিয়াদি*, মানে অভিযোগ চিত্রমালা। এই নামটি আসলে *মির্যা গালিবের* একমাত্র উর্দু কাব্য সঞ্চয়নের প্রথম গজলের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম দুটো শব্দ। ইতিহাসের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে বর্তমানে আত্মস্থ করবার এ এক অসাধারণ নজির। এই সঙ্কলনের নামটিরও একটা অর্থবোধকতা আছে। পাঠক মনোনিবেশ করলে ধরতে পারবেন।

সদ্যপ্রয়াত (২৫ আগস্ট ২০০৮) উর্দু কবি আহমেদ ফারাযের কিছু কবিতা বেছে নিয়ে এই সঙ্কলনে দেয়া আছে। একেবারে দাগ টেনে কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। তার কারণও আছে। বিভিন্ন কালে কবিরা যা বলতে চেয়েছেন তার উপাদান সমাজ ও ইতিহাসপ্রেক্ষিতে তাঁরা ভিন্ন ভিন্নভাবে পেয়েছেন। প্রাক্‌পুঁজিতন্ত্রের কালে মানুষের জীবন ধারণ আর জীবনাচারণের মাঝে খোলামেলা ফাঁকা জায়গা ছিল। আজকের অর্থে ব্যক্তিসর্বস্ব মানুষ ছিল না তবে জগতকে কাঠামোনির্ভর পদ্ধতির বাইরে দাঁড়িয়ে আলাদা করে দেখা বা বুঝতে চাইবার অবকাশ ছিল। ফলে ধ্রুপদী কবিরা বিভিন্ন ধরনের কবিতা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করতে ব্যবহার করতে পারতেন, যেমন প্রশস্তির জন্য *কাসিদা*, প্রেমালাপনের জন্য *গজল*, শোকের জন্য *মর্সিয়া*, দীর্ঘ কাব্যের জন্য *মসনভি*, ইত্যাদি। পুঁজির জগত জয়ের সাথে সাথে এসব আলাদা আলাদা যা কিছু কঠিন সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। জগতের বহুবর্ণ উপস্থিতি উহ্য হয়ে কেন্দ্রে দেখা দিল বিচ্ছিন্ন একাকী মানুষ। অস্তিত্বের এত বড় বিপর্যয় এর আগে আর কোন সামাজিক কালে দেখা যায়নি। চারদিকে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে ঘন অন্ধকারের আহত নৈরাশ্যে এই ব্যক্তি সর্বস্ব মানুষ শুধু নিজেকেই ছুঁয়ে স্পর্শ করতে পারলো। নিজেকে হারিয়ে ফেলার কালযন্ত্রে তাই তার একক আসীনতা হয়ে গেল মুখ্য। ফলে ভাবনার বৈচিত্র সঙ্কুচিত হয়ে উপস্থাপনের রূপেও টানাপোড়েন আসা শুরু হল। আজকের উর্দু কবিতাতে বিভিন্ন কাব্য ধরনে সেই সর্বব্যাপী নিজেকে হারায়ে খোঁজার বেদনা প্রবলভাবে বেজে উঠেছে। বহু ধরনের কবিতা লেখার কাল নেই, যে দু-একটি ধরন যেমন গজল বা মুক্ত ছন্দের নযম তা ভাব বৈচিত্র ধারণ করলেও বিষয় বৈচিত্র ধরে না। ফলে এই সঙ্কলনে কবিতাগুলো সে রকম আলাদা করে দেয়া হয়নি। ভাবের ঘরে দড়ি টেনে ছক করে দিতে চাওয়া পাঠকের ওপর অন্যায়

জুলুম হত, বিশেষ করে কবিতা নিজেই যখন মানবসমাজকে কাঠামো বা এক দিকমুখী পদ্ধতির জোয়াল টানানোর বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী প্রকাশ।

সঙ্কলনে মূলত চয়ন করা হয়েছে গজল থেকে। ফারায গজলের কবি। চয়ন করে নেয়া গজলের পঙ্‌ক্তিগুলোর রস পেতে হলে গজলের কাঠামো সম্পর্কে বলে নেয়া ভালো। পরিচিত অর্থে একটি গজল একটি মাত্র কবিতা নয়। একটি গজলে পাঁচ-সাতটি থেকে গোটা বিশেক পর্যন্ত পঙ্‌ক্তি বা শের থাকতে পারে। সাধারণত ভাবের ঐক্য থাকে না, ছন্দ ও মিল কঠোরভাবে তাদের বেঁধে রাখে। একদম প্রাথমিক উদাহরণ দেয়া যাক, ফারাযের গজল থেকেই—

*কঠিন হ্যায় রাহগুজার, থোরি দূর সাথ চলো*
*বহুত কড়া হ্যায় সফর, থোরি দূর সাথ চলো*
(বড় বন্ধুর এই পথ, কিছু দূর সঙ্গে চলো
অনিবার্য এই যাত্রা, কিছুদূর সঙ্গে চলো)

এই হচ্ছে গজলের প্রথম শের যাকে *মাত্‌লা* বলা হয়। প্রতি লাইনের শেষে থোরি দূর সাথ চলো শব্দগুলো ফিরে আসেছে, এর নাম *রদিফ*। আবার রদিফের আগে দুই লাইনেই দেখবেন *রাহগুজার* আর *সফর* শব্দ দুটোতে 'র' ধ্বনি আছে, এই ধ্বনি বা অক্ষর ফিরে আসার ব্যাপারকে বলা হয় *কাফিয়া*। উর্দু কবিতা সাধারণত শ্রোতাদের সামনেই কবিরা পাঠ করেন, উর্দুতে বলা হয় *গজল কেহ্‌না* মানে *গজল বলা*, পাঠ করা নয়। এবার দ্বিতীয় শের—

*তামাম উম্র কাঁহা কোঈ সাথ দেতা হ্যায়*
(সারাজীবন কে কবে সঙ্গে থেকেছে)

এখানে রদিফ বা কাফিয়ার ঝামেলা নেই, ছন্দের কড়াকড়ি আছে। শ্রোতারা এই লাইন শুনে তা বারবার মুখে উচ্চারণ করলেন। কবিও ঘুরেফিরে বেশ কয়েকবার একই লাইন পড়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় লাইনে তাঁকে আবার রদিফ আর কাফিয়া মেলাতে, মানে *থোরি দুর সাথ চলো* শব্দবন্ধ থাকবে তাতে, তার আগে 'র' ধ্বনিও থাকবে। শ্রোতারা তা জানেন, কবির কবিত্ব প্রকাশের জন্য তিন চারটি শব্দ মাত্র হাতিয়ার। শ্রোতারাও মনে মনে মেলাচ্ছেন সেই গোটা কয়েক শব্দ কী হতে পারে! রুদ্ধশ্বাস শ্রোতাদের সামনে কবি এবার পড়লেন—

*য়ে জানতা হু মগর থোরি থোরি দুর সাথে চলো*
(সেই কথা আমি জানি, তবু কিছু দূর সঙ্গে চলো)

শ্রোতাদের জল্পনাকল্পনা শেষ হয়ে প্রবল 'বাহ্‌, বাহ্‌' এর হুল্লোড় পড়ে গেল। এমনি করে *শের* এগোতে থাকে। তাতে প্রিয়ার অবহেলা, ভাগ্যের বঞ্চনা, উপদেশদাতার প্রতি শ্লেষ, ধর্মগুরুকে বিদ্রূপ এমনকি ঈশ্বরের সাথে ঠাট্টা (*শোখি*) পর্যন্ত বহু বিচিত্র বিষয়ের সমারোহ থাকতে পারে। শেষে সাধারণত কবি নিজ নামের ভনিতা যুক্ত শের পড়ে গজল শেষ করেন যাকে *মাখতা* বলা হয়। এই সঙ্কলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতলা ও মাখতা বেছে নেয়া হয়েছে।

(২)

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর আত্মজীবনীর পূর্বাভাসে জানাচ্ছেন—

> *তিনটে সরল কিন্তু সর্বপ্লাবী আবেগ আমার সারাটা জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে : ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের তৃষ্ণা আর মানবজাতির দুর্দশার প্রতি অসহনীয় দরদ। প্রবল ঝঞ্ঝার মতো এই আবেগগুলো আমায় এদিকে-ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, স্বেচ্ছাচারীর মতো ছুঁড়ে ফেলেছে কখনো যন্ত্রণার মহাসমুদ্রে, কখনো নিয়ে গেছে হতাশার প্রায় প্রান্তে।*

এই রাসেল জ্ঞান আর জাগতিক মানব দুর্দশার ফারাক ঘোচাতে গিয়ে ভাবলেন—জ্ঞানের প্রকাশ যে ভাষা ধারণ করে, তার মাঝের মানবিক আবেগ আর ভাব জ্ঞানের প্রকাশ তথা অন্বেষণ আর বাস্তবায়নে নিদারুণ বাধা সৃষ্টি করে। তিনি চাইলেন প্রকাশের এমন মাধ্যম যা এই ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবে। রাসেল অজুহাত দিতে গিয়ে বলেছিলেন—আমরা যা বলি তা আসলে যা বলতে চাই তা বলতে না পারার অক্ষমতার বেদনার প্রকাশ। এতশত ঝামেলা পার হয়ে ভাষান্তরে কতটাই বা বোঝানো যায় সে ধন্দ বহু পুরনো। তাই ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে প্রতিটি কবিতার পাশাপাশি বাংলা বর্ণে উর্দু উচ্চারণে মূল কবিতাও দেয়া হল।

গদ্য ভাষান্তর মূলানুগ, শাব্দিকের খুব কাছাকাছি। এর চেয়ে মূলের ঘনিষ্ঠতা উর্দুর মেজাজ নষ্ট করে দিতো আরো বেশি। এখানে *কবীর* অনুবাদ প্রসঙ্গে *ক্ষিতিমোহন সেন*কে বলা *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের* কথার সাথে সঙ্কলক একমত—

> *মূলকে অতি সামান্য পরিমাণেও ছাড়িয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাতে যদি ভাব অস্পষ্ট হয় সেও ভাল। ভাবের কিছু পরিমাণে অস্পষ্টতাই দরকার—অতি স্পষ্ট হলে তার অর্থ ছোট হয়ে যায়—কবিতা তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা নয়, এই জন্য তার কাছে স্পষ্ট কথার দাবী খাটবে না।*

(৩)

ফারায যে ধারার কবি তাকে উর্দু কাব্যের ইতিহাসে *তরক্কিপসন্দ্* বা প্রগতিশীল ধারার ফল বলা হয়। *তরক্কিপসন্দ্* ধারা উর্দু কবিতাতে নতুন তাজা রূপকল্প গঠন নিয়ে আসে, মুক্ত ছন্দের *নয্‌ম* সৃষ্টি হয়, নাটকীয়, রূপকনির্ভর কবিতা লেখা শুরু হয়, ছন্দ নিয়ে নিরীক্ষা হতে থাকে ব্যাপকভাবে। এসবের সাথে যুক্ত হয় ভাবাদর্শিক হাল হকিকত যার প্রধান কারণ এই ধারার মূলই ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন। নতুন সমাজের আবাহনের প্রয়োজনে উর্দু কবিরা ক্ষয়িষ্ণুতাকে বাতিল করে উর্দু কাব্যের *ঐতিহ্যে* বহাল দশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপাদান খুঁজে বের করতে লাগলেন, কাব্য উৎপ্রেক্ষার আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করে তাকে জনমানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষণীয় হল।

অনেক প্রগতিশীল কবি তাঁদের কবিতা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হন। *রামপ্রসাদ বিসমিল* গজল গাইতে গাইতে ফাঁসিতে চড়লেন—

*সরফরোশি কি তামান্না আব হামারি দিল মে হ্যায়*
*দেখনা হ্যায় যোর কিতনা বাযুয়ে কাতিল মে হ্যায়*

*রেহ রাওয়ে রাহে মুহাব্বত রেহ না জানা রাহ্ মে*
*লয্যতে সেহরা নাওর্দি দুরিয়ে মনযিল মে হ্যায়*
(আমাদের হৃদয়ে এখন সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার বাসনা
ঘাতকের বাহুতে কত শক্তি দেখা যাক

হে প্রেমের পথের পথিক, পিছে পড়ে থেক না
গন্তব্য যত দূরে, বিরান মরুতে ঘুরে বেড়ানোর ততই আনন্দ)

এই কবিরাই শ্লোগান তোলেন—*ইনকিলাব যিন্দাবাদ* (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক), যে শ্লোগান ভারতবর্ষের কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। এই প্রগতিশীল আন্দোলনে বহু মত ও পথের সম্মিলন ঘটে। একদিকে ছিলেন গান্ধীবাদে স্থির বিশ্বাসী প্রেমচন্দ্, অন্যদিকে কট্টর মার্ক্সবাদী সাজ্জাদ যহির, মাঝখানে অগণিত দোদীপ্যমান কখনোবা আধা অনিশ্চিত কিন্তু স্বাধীনতা প্রশ্নে অবিচল নক্ষত্র।

তরক্কিপসন্দ আন্দোলনের মূল প্রস্তাবনা ছিল *শিল্প, প্রয়োগ ও সুন্দরের ঐক্য*। তবে তা কিন্তু অতীতের বিরুদ্ধে কোন নাড়িছেঁড়া প্রলয় বা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কোন অন্ধ, রাগী বিদ্রোহ ছিল না। সে ছিল বেণিয়া যুগে হারিয়ে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধ আবিষ্কার, ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার চাপে ন্যুব্জ মানুষকে নিজের পায়ে মাথা উঁচু, চোখ তুলে দেখতে দেয়ার লড়াই। সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন উর্দু কাব্যে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চৈতন্য আর সতেজ কাব্যপ্রাণ ফুঁকে দেয়। সর্বোপরি, কয়েকজন মাথা গরম মানুষ এক হয়ে নতুন কাব্য আন্দোলনের ডাক দিল—ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। কবি ও লেখকেরা হৃদয় আগলে রাখা বীজ, আন্দোলন তাদের অনুকূল জল, মাটি আর হাওয়ার জোগান দেয়।

কবিতা যেমন সুর তেমনি সে সালঙ্কার নমিত বা উদ্ধত শব্দাবলি; কবিতা ফুলের বনে ধীর সমীরের গুঞ্জন আবার বৃক্ষ উপড়ে ফেলা ঝড়ের গর্জন; কবিতা সবুজ ঘাসে মৃদু শিশির পতনের শব্দ, আবার বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গী অঝোর বৃষ্টি, কবিতা কোমল ঠোঁটের হাসি আবার বধ্যভূমিতে নিহতের তীক্ষ্ণ চিৎকার, কবিতা জেগে ওঠা মানুষের মিছিলের মিলিত গান, ইতিহাসের পা ফেলার সিম্ফনি। কবিতা আরো অনেক কিছু, অনেক কিছু নয়।

কবিতার বিষয় কি রাজনীতি, প্রেম না ঘটনার খতিয়ান খাতা? আসলে কবিতা মানুষজীবনের সব প্রেক্ষিত ধারণ করে, কারণ সমগ্র সাহিত্যের মতোই কবিতারও মূল বিষয় মানুষ। কালে কালে, মানুষ আর সমাজ নিয়ে সে তার সৌন্দর্যে ভাষায় আমেজ বদলায়, বদলায়

ধরন, উপমা আর উপমেয়র মেজাজ। মার্কিন কবি *কার্ল স্যান্ডবার্গ* জানাচ্ছেন—

The people is the great canyon of humanity
　　and many many miles across.
The people is Pandora's Box, humpty dumpty, a clock of doom and an
　　avalanche when it turns loose.
The people rest on land and weather, on time and the changing winds.
The people have come far and can look back and say
　　"We will go farther yet".
The people is a plucked goose and a shorn sheep of legalised fraud.
And the people is one of those mountain slopes
　　holding a volcano of retribution.
Slow in all things, slow in its gathered wrath,
　　slow in its onward heave.
slow in its asking: 'Where are we now? what time is it?'

*-The People, Yes; by Carl Sandburg*

কবির সামনে যে কেউ মারাত্মক একটা প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে—*আমরা এখন কোথায়? এ কিসের সময়? আমি, আমরা কারা?* সার্বভৌম মানুষের ইতিহাসে কবিতা অক্ষরের স্বশাসিত রাজ্য, তবে সে নিজের সব আইন তৈরি করে না। সেই আদিকাল থেকে কবিকে এক রকমের নবী বলা হত । ইকবাল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক সার্থক কবি একজন ছোটখাট পয়গম্বর, আল্লাহর বাণী মানুষের কানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কবি এড়াতে পারেন না—*শায়েরি জুয আস্‌ত্ আয্ প্যায়গামবারে* । এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় *কার্ল মার্ক্সকে* নিয়ে *জাভেদনামায়* তাঁর মন্তব্য—

*সাহিবে সর্‌মায়া আয্ নস্‌লে খলিল*
*য়ানি আন্ পয়গম্বরে বে যিব্রিল*

(পুঁজি গ্রন্থের লেখকও নবী ইব্রাহিমের বংশধর
তিনিও নবী যদিও তাঁর কাছে কোন বার্তাবাহক জিব্রাইল আসেনি)।

প্রত্যেক সফল কবির মাঝেই এই নবুয়তির ব্যাপারটা বহুরকমে দেখা যায়। প্রত্যেকেই যেন অনাগত ফুলবাগানের বুলবুল, গালিবের জবানিতে শুনুন—

*হু গর্মিয়ে নিশাতে তসব্বুর সে নগমা সন্‌জ*
*ম্যায় আন্দালিবে গুলশানে না আফ্রিদা হুঁ*

(তার ধ্যান আনন্দের উত্তাপে আমার অবিরাম সুরের ধারা
আমি যে বাগানের গানের পাখি, তা আজও ধরার বুকে জন্ম নেয়নি)

গালিব এখানে *গান* বলছেন না, বলছেন *সুর*। নিজের বর্তমানে বাস করে অনাগত ভবিষ্যতের বারতা তো বর্তমানের কানে বোধগম্য হবে না, ধরা যাবে শুধু সুরটুকু। কবির এই কাব্য অভিযাত্রায় যে বারতা থাকে তাতে রূপ ও আঙ্গিকের, বার্তা আর শব্দের কোন বিভাজন থাকে না। সফল কবিতার সৌন্দর্য আর উপলব্ধিরও তাই ফারাক খুঁজতে চাওয়া বৃথা। কবিতায় অর্থহীনতা বা অর্থহীনতায় কবিতা খুঁজতে চাওয়া সভ্যতা আর সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতায় মনের বিশেষ দশার পরিচায়ক মাত্র। বছর ষাটেক আগে শিল্পসমালোচক *আনন্দ কুমারস্বামী* তাঁর *The Art of Eastern Asia* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

*বিশ্ব ইতিহাসের বিশাল অংশজুড়েই মানুষের হাতে তৈরি প্রতিটি উৎপন্ন, তা সে মূর্তি, আসবাব বা শার্টের বোতাম যাই হোক না কেন, একই সাথে যেমন সৌন্দর্যের বাহক ছিল তেমনি ছিল কাজের জিনিস। এই সহজ অবস্থা যে কোন জায়গার চাইতে এশিয়াতে বেশি দিন টিকে ছিল।*

. . . *যদি সৌন্দর্য আর কাজে লাগার ব্যাপারটা এখন আর নিত্য ব্যবহারের সামগ্রি বা ব্যবসায়ীর পোশাকে, অথবা কারখানায় তৈরি জিনিসে দেখা না যায়, তার জন্য আমাদের ব্যবহৃত যন্ত্র দায়ী নয়; এটা মানবমর্যাদা অবমূল্যায়ন এবং তার ফলে বাস্তব মূল্যের প্রতি আমাদের অসজাগতার ফল।*

কুমারস্বামী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ভারতীয় স্থাপত্যের পাঁচ হাজার বছরের প্রগাঢ় অধ্যয়নের পর। এই বিখ্যাত বইটা না পড়েই *মজরুহ সুলতানপুরি* অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। ১৯৪৪ সালে বোম্বে আসা পর্যন্ত তিনি গৎবাঁধা গজল লিখতেন। কিন্তু একবার *অজন্তা-ইলোরা* ঘুরে এসে তিনি প্রগতিশীল লেখক সংঘে যোগ দেন। প্রথাগত সুদূর পরম সৌন্দর্যের খোঁজ তাঁর কাছে অহেতুক মনে হল, তিনি লিখলেন—

*দেহের মে মজরুহ কোঈ জাওয়েদান মযমুন কাঁহা*
*ম্যায় জিসে ছুতা গ্যায়া ও জাওয়েদান বনতা গ্যায়া*

(এই নশ্বর জগতে, মজরুহ, অনন্ত কি আছে
আমার কবিতা যাকে স্পর্শ করলো, সেই সীমাহীন হয়ে গেল।)

কম্যুনিস্ট বলে বারবার কারারুদ্ধ, দেশান্তরি, যার কবিতা নিষিদ্ধ হয়েছে বারবার, প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফয়েজ ১৯৫০ সালে জেলখানায় বসে লিখছেন—

*হাম নে জো তর্যে ফুগাঁ কি হ্যায় কফসমে ইযাদ*
*আজ গুলশান মে ওহি তর্যে বয়াঁ ঠেহ্‌রি হ্যায়*

(আমরা খাঁচায় বন্দি হয়ে যে মাতমের সুর সৃষ্টি করেছি
তাই আজ ফুল বাগানে গানের রীতি হয়ে গেছে)

সমকালে আরেক তরক্কিপসন্দ্ *জয্বী* লিখছেন—

*গমোঁ কি দুনিয়া কো রোঁদ ডালে নিশাতে দিল প্যায়মাল্ করলেঁ*
*নয়ি মুহাব্বাত নয়া জুনূঁ হ্যায় খুদায়া কেয়া আপনা হাল করলেঁ*

(দুঃখের জীবন, হৃদয়ের আনন্দ পদদলিত করে চলে যাই
এ নতুন প্রেম, এ নতুন পাগলামো, কি যে করি নিজেকে নিয়ে!)

এই কবিতার মেজাজ একেবারে নতুন। মুক্তি প্রয়াসী ক্লেশের আগুন হতে এর জন্ম। আগের কবিরা ঘাতকের তীক্ষ্ণ তরবারির বাঁকা সৌন্দর্যে বিভোর হতেন, এই প্রগতিশীল কবিরা নিজের হাতেও একটা তরবারি তুলে নিয়েছেন। কবিদের কারবার মনন আর আবেগের অভিজ্ঞতা নিয়ে, যাতে ঝলসে ওঠে মনের জল-হাওয়া, হৃদয়ের মৌসুমের আলো আর গন্ধ। তার মাঝ হতেই কবি আন্তরিক শ্যামলতা নয়তো দগ্ধ মরু সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। ইতিহাসের সবচে' জঘন্যকালে এজন্যেই সবচে' সুন্দর অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, রক্তে ভেজা মাটিতে ফুটেছে গোলাপ।

*রংগ্ প্যায়রাহান কা খুশ্বু যুলফ্ লেহরানে কা নাম*
*মওসমে গুল হ্যায় তুমহারে বাম্ পর আনে কা নাম*

*ফয়েজ* বলছেন—

রঙ তোমার উত্তরীয়, সুগন্ধ তোমার কেশ দুলে ওঠা ছাড়া আর কী
তুমি যখন অলিন্দে এসে দাঁড়াও, আমরা তাকেই বসন্ত বলি।

*মজরুহ* জানাচ্ছেন—

*মুঝে সেহেল্ হো গ্যায়ি মনযিলে ও হাওয়া কি রুখ্ ভি বদল গ্যায়ে*
*তেরা হাথ হাথ মে আ গ্যায়া কে চারাগ্ রাহ্মে জল্ গ্যায়ে*

(ঝড়ের হাওয়া দিক বদলেছে, গন্তব্য এখন সহজসাধ্য
তোমার হাত আমার হাতে, দীর্ঘ পথ প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে)

এই কবিদের নন্দনতাত্ত্বিক চৌহদ্দি অনেক ব্যাপ্ত, তার বিস্তৃতিও ব্যাপক, লক্ষ্য করুন—
*ফয়েজ*—

*দস্তে সাঈয়াদ্ ভি আযিয হ্যায় কফে গুলচি ভি*
*বুয়ে গুল ঠেহ্রি না বুলবুল কি যবান ঠেহ্রি হ্যায়.*

(ব্যাধের হাত শক্তিহীন, ফুল ছেঁড়া হাত বিবশ
ফুলের গন্ধ কয়েদ হয় না, বুলবুলের গান না হয় বন্দী)

*মজরুহ্*—

*সুতুনে দার পে রাখতে চলো সরোঁ কে চারাগ*
*জাহাঁ তলক য়ে সিতাম্ কি সিয়াহ্ রাত চলে*

(বধ্যভূমিতে জ্বালিয়ে যাও শহীদের কাটা মাথার প্রদীপ
যতদিন নিষ্পেষনের এই অন্ধকার রাত না পোহায়)

*মখদুম*—

*কোহে গম অওর গিরাঁ অওর গিরাঁ অওর গিরাঁ*
*গমযাদো তেশ্ কো চমকাও কে কুছ্ রাত কাটে*

(ভারী দুঃখের পাহাড় আরো, আরো, আরো ভারী হয়ে আসে
ও দুঃখ দিনের সাথী, বাটালি তুলে নাও—রাতের পাথর কাটবো চলো)

শেষ উদ্ধৃতিটিতে মখদুম এর বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করবেন। অতি পুরাতন শিরিঁ-ফরহাদ এর গল্পের ভাস্কর ফরহাদ রাজা পারভেজের চালে পড়ে শিরিকে পেতে পাহাড় কেটে নদীর ধারা উন্মুক্ত করতে যায়। শেষকালে রাজ চক্রান্তে নিজের বাটালির আঘাতে আত্মঘাতি হন ফরহাদ। মখদুম তাকে নিতান্ত ধ্রুপদী আঘাতের অস্ত্র হতে সর্বহারার শৃঙ্খল ছেঁড়বার হাতিয়ারে পরিণত করলেন।

*(৪)*

এই প্রসঙ্গে সামান্য গোড়ার কথা বলা যাক।

সুফি ভাবনা জগত সম্পর্কে সম্যক জানা-শোনা না থাকলে উর্দু কবিতার আসল স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের একত্ববাদ, সাম্য আর সামাজিক ন্যায় ভারতীয় সমাজের তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা আর আকাঙ্ক্ষার সাথে মিশে যে সব ফল পাওয়া গেছে তার মাঝে ভারতীয় ভক্তি আন্দোলন অন্যতম। সঙ্গে সুফি ভাবনাও অন্ধমত বিরোধিতায় জোর পেয়েছিল উপনিষদ, বেদান্ত, বহু লোকায়ত ধরনের বৌদ্ধ দর্শনে। সার্বিক প্রেম, অস্তিত্বের ঐক্য, পরম প্রকাশের সর্বব্যাপকতা, সমস্ত সঙ্কীর্ণ মতান্ধতার জাগতিক সামাজিক অস্বীকৃতি, শ্রেণী বিভাজনের মরমী বিলোপ—সুফি ভাবনা আর কাব্যে আপাদমস্তক উপস্থিত। সর্বাত্মক অস্তিত্বমানতার হাত ধরে সুফি দর্শন ও কাব্য বহু প্রকাশকে তওহিদ তথা অখণ্ড সত্তার ভাবে প্রকাশে অভ্যস্ত। ফলে শুধু প্রেম নয়, জাগতিক বেদনা, আনন্দ আর আবেগ তাতে মর্যাদা পেয়েছে। এই বোধ আর জীবনচর্যা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্ন রকমের বিদ্রোহ সৃষ্টি করে যা উর্দু কাব্যের প্রেমমুখীনতা বুঝতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উর্দু কাব্যের কেন্দ্র এই প্রেম ভাব ভক্তি আর সুফি ভাবনার মিলনে গড়ে ওঠা মরমী, ভাবগত ভাবনা আর সমাজতাত্ত্বিক গঠনের একটা প্রকাশ্য রূপ বিশেষ। প্রেম, বেদনা এখানে উপস্থিত শুধু একক ব্যক্তিক বেড়ায় ঘিরে নয়, বরং প্রেমাস্পদের দেয়া বেদনা আর কালের বেদনার সীমা এখানে নিয়ত

বিলীয়মান। পরিপার্শ্বের বাস্তব, কবির ব্যক্তি বিশেষত্ব, শক্তিমত্তা বহাল কাব্য রীতিকে পাল্টে কবির সৃজনশীলতার সাথে ছন্দময় সাম্যে প্রেমকে প্রজ্ঞায় রূপান্তর করে, সেই প্রেম আর শুধু একান্ত থাকে না, অনেকান্ত হয়ে যায়।

সুফি প্রেম জগতে জীব আর পরমের প্রেম সর্বদাই নর-নারীর প্রেমের রূপকে প্রকাশিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পারস্য সুফি *সাদউদ্দিন মাহমুদ শাবিস্তারির গুলশানে রায* গ্রন্থে এই রূপকগুলোর বিস্তৃত আলাপ পাওয়া যায়। ঘুম এখানে ধ্যান, প্রিয়ার কেশের গন্ধ মানে মরমী নৈকট্য, কাফের মানে শুদ্ধ বিশ্বাসী, কোন মতেই অবিশ্বাসী নয়, সুরা মানে আত্মিক জ্ঞান, সাকী-সুরা পরিবেশনকারী হচ্ছে মরমী পথ প্রদর্শক মুর্শিদ, পানশালা মানে যেখানে সৌন্দর্য্য হচ্ছে প্রেমাস্পদের মহিমা, তিল হচ্ছে অটুট অদ্বৈততার কেন্দ্র। এই রূপকল্পগুলোই কালে কালে সমাজ পরম্পরায় নতুন আর বিস্তৃত মানে ধারণ করেছে। নতুন কাব্য বোধে *লায়লার* দর্শন অভিলাষী *মজনুঁ* খুব মসৃণ ভাবেই বিপ্রতীপ কাল বদল প্রয়াসী মানুষে পরিণত হয়েছেন। কাব্যের নান্দনিক আয়তনের সঙ্গে সমাজ বদলের এই অভিনব কিন্তু ঐতিহ্য অনুসারী মিতালি নতুন উর্দু কাব্যের খুব বড় অর্জন। এই অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল *ইকবালের* হাত ধরে। যে কয়েকজন কবি রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন। উর্দু কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সচেতনভাবে পুঁজিপতি (*সরমায়াদার*), সর্বহারা (*নাদার*) শব্দগুলো ব্যবহার করেন। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পর তিনি লেখেন *সরমায়া ও মেহনত* (পুঁজি ও শ্রম) কবিতাটি। দীর্ঘ কবিতাটির কিছু পঙ্‌ক্তি দেখা যাক---

*দস্‌তে দৌলত আফ্‌রিঁ কো মজদুরি মিলতি রহি*
*এহলে শর্‌ওত জ্যায়সে দেতে হ্যায় গরিবোঁ কো যাকাত*

*নস্‌ল, কওমিয়াত, কলিসা, সলতানাত, তেহযিব, রঙ্গ*
*খোয়াজ্‌গি নে খুব চুন চুন কে বানায়ে মসকারাত*

*মক্কর কে চালো সে বাযি লে গ্যায়া সরমায়াদার*
*ইনতিহায়ে সাদ্‌গি সে খা গ্যায়া মজদুর মাত*

*উঠ কে আব্‌ বযম্‌ জাহাঁ কা অওর হি আন্দায হ্যায়*
*মশরিক ও মাগরিব মে তেরে দওর কা আগায্‌ হ্যায়*
(সম্পদ সৃষ্টি করা হাত শুধু মজুরি পেয়ে গেল
ধনীর হাত দরিদ্রকে যেন ভিক্ষা দেয়

জাতি, বর্ণ, ধর্মগৃহ, সংস্কৃতি, সাম্রাজ্য, সভ্যতা
সাম্রাজ্যবাদ খুব বেছে বেছে এইসব নেশা তৈরি করেছে

ধোকা চাল চেলে খেলা জিতে নিল পুঁজিপতি
ছূড়ান্ত সরলতায় হেরে গেল শ্রমিক
ওঠো, জগত আসরের মেজাজ পাল্টে গেছে
পুবে আর পশ্চিমে তোমার যুগ হয়েছে শুরু)

১৯২২ সালে লেখা এই কবিতাতে ইকবাল বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ইকবাল সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, মার্ক্সীয় এই জগত জাগরণ মধ্যযুগের স্পেন ও ইরাকের মুসলিম বৌদ্ধিক অর্জনের য়ুরোপীয় *রিফর্মেশন* ও *রেনেসাঁ* হয়ে আধিপত্যের বিরুদ্ধে চলমান মানব মুক্তি প্রচেষ্টা।

*(৫)*

১৯৪৭ এর পর পাকিস্তানের কবিরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজেদের অবরুদ্ধ দেখতে পেলেন। ভাবনাচিন্তাকে শেকল পরানোর সমস্ত আয়োজন যেখানে নিখুঁত। উর্দিপরা শাসকদের সাথে মোকাবিলা হয়ে উঠলো পাকিস্তানের কবিদের কাব্যপ্রেক্ষার মানদণ্ড। এর ভিন্ন ধাপও ছিল। তা তো নতুন কিছুও নয়। বুদ্ধিজীবী আর শিল্পীরা ক্ষমতায় যত কাছ ঘেঁষা হন সৃজন তত দুর্ভোগ পোহায়। মধ্যযুগের মুসলিমরাও দেখেছে দুই ঘরানার কবি—একদিকে *শায়েরুল খিলাফা*, রাজধানী *দারুল খিলাফায়* বাসকারী রাজা-উজিরদের কৃপা ধন্য কবি; অন্যদিকে *শায়েরুল ইমামা*, প্রায়শই প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবন কাটানো, সমাজের হৃদস্পন্দনের কাছাকাছি বাসরত, ক্ষমতাকে সত্য কথা ছুঁড়ে দেয়ার সাহসওয়ালা কবি।
এই দ্বন্দ্ব আমাদের কালে ইতালিয় মার্ক্সপন্থী দার্শনিক *আন্তনিও গ্রামসি* আবার তুলে ধরেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। গ্রামসি এই প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত টানছেন যে, সিভিল সমাজ যদি রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড নির্বিচার নীরবতায় মেনে নেয় তবে রাষ্ট্র সর্বাত্মকবাদী হয়ে উঠবে, এর উল্টো হলে পরস্পর বোঝাপড়া থাকলে একরকম গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করবে, সবশেষে, রাষ্ট্র আর সমাজ যদি গঠন আর সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিপরীত, বিরোধাত্মক অবস্থানে থাকে তবে নৈরাজ্য আর গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এই পরিস্থিতিতে সংস্কার বা বিপ্লবের প্রস্তাবনা নিয়ে সমাজের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা কোন অবস্থানে থাকেন তা তাদের নিজেদের সাথে সমাজের নিয়তি নির্ধারণেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।
আহমেদ ফারায গ্রামসীর বলা তিন নম্বর পাকিস্তানে কবিতা লিখেছেন। এর গোড়ায় আছে ক্ষমতার বর্তমান কাঠামো আর ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতি। ফারাযের পাকিস্তানে ক্ষমতা কাঠামো গ্রামীণ অর্থনীতি জিইয়ে রাখবার ছকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারে পাওয়া, যার নিয়ন্ত্রক সামন্ত সামরিক আমলাতান্ত্রিক অভিজাতরা। অথচ পাকিস্তানের ক্রমে জোরদার হওয়া শিল্প অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণী আর শহুরে মধ্যবিত্তরা এখন মোট জনসংখ্যার প্রায়

৩০ শতাংশ, জাতীয় অর্থনীতিতে যাদের অবদান পঞ্চাশ ভাগ। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের আর সমাজের সম্পর্ক এখানে একদম অকার্যকর হয়ে আছে।

এমন দশায় শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধের মিথজীবিতা না থাকলে শিল্প দুস্থ হয়, বুদ্ধিবৃত্তি অসার হয়, মানুষ ভবিষ্যতের ওপর আস্থা আর আশা খুইয়ে বসে। পাকিস্তান এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। খ্যাতনামা পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী *ইকবাল আহমেদ* জানাচ্ছেন—

> *গত যে তিন দশক আমি দেশের বাইরে কাটিয়েছি, সে সময়ের তিন শাসক –আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো। এ সময়ের কবিরাই আমাকে দেশের মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে। এই কবিরা রাস্তা আটকে দেয়া ভিভিআইপি নন, তারা আমাদের ইতিহাসে দুর্লভ গৌরবের জন্মদাতা।*

পাকিস্তানের উর্দু কবিদের এই আধিপত্য বিরোধের গোড়ায় ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ জেল খেটেছেন *রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায়*। একাধিকবার জেলখাটা *হাবিব জালিব আদমজী পুরস্কার* প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, আমি আমার জনগণের জন্য কবিতা লিখি, কোন আদমজীর জন্য লিখি না। আহমেদ ফারায প্রথম জেলে গেলেন ১৯৭৭ সালে। জুলফিকার ভুট্টোর আমলে। আইয়ুব আমল থেকে পারভেজ মোশাররফের কাল পর্যন্ত আমৃত্যু ফারায ছিলেন ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অন্যান্যরা যা ফিসফিস করে বলতো, ফারায তা কবিতায় উচ্চকিত কণ্ঠে বলতেন। ফলে চাকরিচ্যুতি, জেল, নির্বাসন সব সইতে হয়েছে।
শিল্প বা কবিতার মূল্যকে যারা পরম বলে প্রলয়কালেও গজদন্ত মিনারবাসী হন ফারায তাদের দলের নন। কবির কল্পনা, কর্মীর প্রত্যক্ষ, ভাবুকের অনুভূতি আর সাধারণের জীবনচর্যার মাঝে যখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে সেই হল অসুন্দর। ফারায বলেছেন—

*ফারায ইশক্ কি দুনিয়া তো বহুত আচ্ছি হ্যায়*
*য়ে ফিত্না হিজ্র্ ও জুদায়ি কিসনে রাখ্খি হ্যায়*
(ফারায, প্রেমের পৃথিবী তো বড় সুন্দর দেখি
এর মাঝে বিরহ বিচ্ছেদের আপদ রাখলো কে?)

এখানে সৌন্দর্যসাধনা জীবনের কাছে এসে আরো বড় প্রেক্ষাপটে জীবন রচনা হয়ে ওঠে। মানুষের আটপৌরে জীবনের দৈন্য, হতাশা যে কত ব্যাপক ও তীব্র, তা যে খোদ আরাধ্য, শ্রেয় আর কাঙ্ক্ষিত জীবনের সাথে যাপিতজীবনের বিরহ-বিচ্ছেদ টেনে দেয় তা আজকের কবিকে বুঝতেই হয়। গালিব এই জাগতিক অত্যাচার নীরবে সয়ে স্থিত প্রাজ্ঞ হওয়ার সাধনায় জীবনকে ব্যর্থ করেও কাব্যকে সুন্দর করার আকাঙ্ক্ষী—

*হাম ভি তসলিম্ কি খু ডালেঙ্গে*
*বে নিয়াজি তেরি আদাত্ হি সহি*

(সব মেনে নিতে শিখবো আমিও
উদাসীনতাই যদি তোমার অভ্যাস হয় তো হোক।।)

ফারায কিন্তু এই আত্ম-সংবরণের পক্ষে নন —

*শিকওয়ায়ে যুল্‌মাতে শব সে তো কাঁহি বেহতর থা*
*আপনে হিস্‌সে কি কোঈ শাম্মে জ্বালাতে জাতে*

(রাত্রির অন্ধকারের বৃথা অনুযোগে কি লাভ
তারচে' নিজের ভাগে যে প্রদীপ—তাকেই না হয় জ্বালিয়ে যেতে)

এটা কি সচেতনভাবে *নীতিশিক্ষাবাহী (Didactic)* কবিতা হয়ে গেল? ফারাযের যত উপদেশ আসলে নিজেকেই—

*ইক তো খোয়াব লিয়ে ফিরতে হো গলিয়োঁ গলিয়োঁ*
*উস্‌পে তক্‌রার ভি করতে হো খরিদ্‌দার কি সাথ*

(একে তো স্বপ্ন ফেরি করো অলিগলিতে
তার ওপর খরিদ্দারের সাথে জুড়ে দিয়েছো তর্ক।)

চৈতন্যসম্পন্ন জীব, তদুপরি কবি হিসেবে ফারায প্রত্যক্ষের নান্দনিক ও নৈতিক মূল্যও বিচার করতে পিছপা হন না—

*এ্যায় খুদা জো ভি মুঝে পন্‌দে শাকেবানি দে*
*উসকি আঁখো কো মেরি জখম কি গেহরায়ি দে*

(হে ঈশ্বর, যত ইচ্ছে আমায় ধৈর্যের উপদেশ দাও
সেই সাথে শুধু তার চোখে আমার ক্ষতের গভীরতা দিও)

এই চোখ যেন নিজেকে চেনার আয়না। (স্মরণ করুন—আমরা যখন অপরের দিকে তাকাই তখন আসলে নিজের দিকেই তাকাই—*কার্ল মার্ক্স, ১৮৪৪ এর পাণ্ডুলিপি*), সমস্ত ইন্দ্রিয়, তার বাহিত, সংগৃহিত কিন্তু সামঞ্জস্যহীন জগত দৃশ্য ও অনুভূতির পাওনা একাকিত্বের বেদনার প্রতীক এই চোখ। জগতকে যতটুকু ভোগ করা গেল, অধিকার করা গেল তাতেই তাকে খর্ব করে ফেলার বিপরীতে এ এক ভিন্ন সাধনা। ফারাযের এই আকাঙ্ক্ষা আসলে অনেক প্রবল, তীব্র দাবি। গালিবের সঙ্গে আরেকবার প্রতিতুলনায় যাই—

*ও আঁয়ে ঘর মেঁ হামারে, খুদা কি কুদরত হ্যায়*
*কভি হাম উনকো, কভি আপনে ঘরকো দেখতে হ্যায়*

(উনি এলেন আমার ঘরে! কী লীলা ঈশ্বরের;
আমি একবার তাকাই তার মুখের দিকে, একবার আমার ঘরের দিকে।।)

গালিবের পাওয়া বড় আকস্মিক, অপর পক্ষের কৃপা মাত্র যেন, তিনি একবার তাকান পরম অতিথির পানে, একবার নিজের ছন্নছাড়া ঘরের দিকে। ফারাযের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন—

*দেখো য়ে কিসি অওর কি আঁখে হ্যায় কে মেরি*
*দেখুঁ য়ে কিসি অওর কা চেহরা হ্যায় কে তুম হো*

(দেখো তো একি আমার না অন্য কারোর চোখ
দেখি তো একি অন্য কারোর মুখ, নাকি তুমি)

এখানে আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তিকে আত্মমগ্নতার জলে স্নান করানোর অভিপ্রায় নেই, প্রাপ্তির প্রকরণের মাঝে কবি স্বয়ং অনেক জোরদার হয়ে উপস্থিত। তবে নতুন প্রাপ্তির আবহে নিজেকে চিনে নেয়ার তাগিদ স্পষ্ট। প্রতিটি নতুন দর্শনের পর দৃষ্টিও নতুন হয়ে জন্ম নেয়। এ যেন *টেনিসনের* ওক বৃক্ষ, যার ছায়া পার হওয়ার পর পথিক আর আগের জন থাকেন না। গালিবের কাল হতে ফারাযের কাব্য পরিমণ্ডলে স্বকীয়তার উপস্থিতি বেশি। গালিব আকাঙ্ক্ষার জন্য শত নির্দয়তায় অপেক্ষা আর আকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিকে পরম মেনে নেন—

*দেখিয়ে পাতে হ্যায় উশ্শাক বুতোঁ সে কেয়া ফয়েজ—*
*ইক বারহামান নে কাহা হ্যায় কে য়ে সাল আচ্ছা হ্যায়*

(দেখা যাক, প্রেমিকেরা এবার পাষাণ প্রতিমাদের কাছে কি পায়
এক গণক জানিয়েছে এ বছর ভালোই যাবে)

বদলাবে না কিছুই, চিরকালের মতোই এবারও প্রেমিকেরা সেই চিরনির্দয়, উদাসীন সুন্দর পিত্তল মূর্ত্তিকাদের কাছে নিশ্চুপ কৃপা প্রার্থনা করে যাবে! তবে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার ছল—কোন এক গণক বলেছেন এ বছর ভালোই যাবে। অপরিবর্তনীয় আলোকহীন নৈরাশ্যে প্রভাবহীন এটুকু আশা আবিষ্কার করতেই হয়। এই আপাত অপরিবর্তনীয়, ক্রিয়াহীন আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেন ফারায—

*না শব-ও- রোয হি বদলে না য়ে হাল আচ্ছা হ্যায়*
*কিস বারহামান নে কাহা থা কে য়ে সাল আচ্ছা হ্যায়*

(না বদলালো এই দিনরাত, না এই হাল যাচ্ছে তেমন ভালো
কোন গণক বলেছিল এ বছর যাবে ভালো!)

যে চলমানতা মানুষের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের ইতিহাস সৃষ্টি করে তাকে ফারায চিনে নিতে উদাসিন নন। প্রত্যহের তুচ্ছতার মাঝে যে সীমাবদ্ধতা তাতেই চূড়ান্ত নির্ধারণতার ভ্রম জন্ম হয়, মনে হয় আমাদের ঘিরে আছে যে চারপাশ তা যেন নিজেই সম্পূর্ণ। অপরিবর্তনীয়তা নয়, পরিবর্তনই এত চিরন্তন যে তাকে চিনে নিতে হয়, যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যহের অনুভবে ধরা পড়ে না। ব্যক্তি অনুভবের আপাত

সম্পূর্ণ কয়েদখানার আবহাওয়ায় সত্যান্বিত অনুভূতি নিজের চারপাশে মনোজাগতিক নিরাপত্তার আমেজ সৃষ্টি করে। তার মাঝে কোন রকম চিড় ধরলে তা অপুষ্ট ব্যক্তি অস্তিত্বকে যেন বিনাশের হুমকি দেয়। ঘটিত, ঘটমান আর সম্ভাব্যতার ক্রিয়াকর্মের দ্রষ্টা সত্তা কবি তাতে যেন পুলকিত হন, তিনি নিজের এই সতেজ যাত্রায় যা কিছু প্রাপ্তি শুধু নিজেই দেখেন না, দেখাতেও সমান আগ্রহী-

*দেখো য়ে মেরা খোয়াব থা, দেখো য়ে মেরা যখ্ম হ্যায়*
*ম্যায়নে সব হিসাবে জাঁ বর্‌সরে আম্ রাখ দিয়া*

(দেখো এই ছিল আমার স্বপ্ন, দেখো এই আমার সব ক্ষত
আমি তো প্রাণের সব কড়া-ক্রান্তি সবার সামনে মেলে ধরেছি)

এ যেন ভেতর আর বাহিরের জীবনকে অখণ্ড অস্তিত্ব দেয়ার প্রয়াস। এই অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে গেলে অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত সম্পূর্ণতা হারিয়ে যায়। তারপরও যারা ঘটমানতার সাথে অস্তিত্বের সমগ্রতার যোগ খুঁজে ফেরেন—তাদেরকেই কবি, কখনো মরমী, কখনো অবিশ্বাসী বা ক্ষ্যাপা বলে ডাকা হয়। এই কবি বা ঘটমানতায় অন্তহীন আবর্তে অবিশ্বাসীরা 'সাধারণ' মানুষের মাঝের অস্বীকার করা অংশটুকু ছাড়া আর কি? তারা তো সাধারণের সহজের, কালের অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের বাস্তবায়নকারী। কালের অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের সহজতার ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ তাই তার কর্তব্যকর্ম। সময় তাঁর কাছে সদা উন্মুক্ত দুয়ার, যে দুয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, এপারে কবির সমগ্র সত্তা একেকটি সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এই ক্রমপ্রসারমানতায় মাঝে ক্রমসৃষ্টি প্রয়াসী সত্তাও তাই কোন নির্দিষ্ট ক্ষণে চূড়ান্ত নয়, ফারায তা জানেন—

*খুদ কো য়ুঁ মেহ্‌সুর কর ব্যায়ঠা হু আপনে যাত্ মে*
*মনযিলে চারো তরফ হ্যায় রাস্তা কোঈ নেহি*

(আমার আমি দিয়ে নিজেকে ঘিরেছি এমন
চারিদিকের গন্তব্য দেখি, কোথাও পথ নেই)

খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন মানব অস্তিত্বের এই বিপদ। জগত যখন '*আমার*' ভোগের, অধিকারের মাইলফলকে বিদ্ধ না হলে আমার হয় না তখন '*আমরা*'ও কেবল মায়াময় স্বতন্ত্রতা হয়ে যায়, চতুর্দিকে গন্তব্য দেখা যায়, কোন পথ দেখা যায় না। যা 'আমি' নই তাকে '*আমার*' করা মানে নিজের অস্তিত্বের বর্ধন, তাকে কোন একটিমাত্র অভিচারে হজম করতে চাওয়া মানে সমগ্রতা প্রতিপাদনে বাধা। ফারায এই বুদ্ধির কুটচালকে চিনতে পেরে বলেন—

*আক্‌ল দিখাতি রহি জ্বলে হাথ আপনি*
*দিল নে হর বার কাহা আগ্ পরায়ি লে লে*

(বুদ্ধি প্রতিবার নিজের পুড়ে যাওয়া হাত দেখায়
হৃদয় বারবার বলে অপরের আগুন তুলে নাও)

যতক্ষণ না কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে সহজের হাতে বুদ্ধি অধীনতা মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ সেই বাস্তব সম্ভাবনার কথা বলে যাওয়া, স্ফূরণ করিয়ে যাওয়া কবির দায়ের মধ্যে পড়ে। তিনি এমন একটি ক্ষণের সকর্মক প্রতীক্ষায় থাকেন যেখানে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত এক হয়ে যায়—

*ম্যায় তো উসি সুবহে দরখশাঁ কো তবঙ্গর জানুঁ*
*জো মেরে শেহের কে হাথ সে কাশ্‌কোলে গ্‌দায়ি লে লে*

(আমি তো সেই আলোকময় ভোরকে ঋদ্ধ বলে মানি
যে আমার শহরের হাত থেকে অন্ধকারের ভিক্ষাপাত্র তুলে নেয়)

সেই ঋদ্ধিমান ভোরের মুহূর্তকে কাছিয়ে আনার কর্মযজ্ঞে কবি একজন বাস্তব, সক্রিয় মানসশ্রমিক। তার সক্রিয়তার, চৈতন্যের বিবৃতির অপরাধের শাস্তি প্রতি মুহূর্তে পেতে হয় বৈকি। প্রেসিডেন্ট *পারভেজ মোশারফের* কালে ফারাযকে *পাকিস্তান ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশনের* চেয়ারম্যানের পদ থেকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধতার জন্য বরখাস্ত করা হল, কবি তাঁর বাসগৃহ থেকেও উৎখাত হলেন। ফারাযের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি শুধু বললেন—

*কওন তাকো যে রাহা, কওন সরে রাহ্‌গুজার*
*শেহের কে সারে চারাগোঁ কো হাওয়া জানতি হ্যায়*

(কে তাকের ওপর হেলান দিয়ে ছিল, কে পথে পথে জ্বালিয়েছে আলো
শহরের প্রতিটি প্রদীপকে চেনে এই শহরের হাওয়া)

*গৃধ্রকূট* পর্বতে সান্ধ্য দেশনা পর্বে বহু ভিক্ষু জনতা উপস্থিত, কিন্তু *গৌতম* বুদ্ধ দীর্ঘক্ষণ নীরব, কোন কথাই বলছেন না। অনেকক্ষণ পর বুদ্ধ একটি পদ্ম ফুল তুলে ধরলেন। সবাই বিস্মিত, এর অর্থ কী! শুধু *ভিক্ষু মহাকাশ্যপ* হাসলেন, বুঝতে পারলেন—কোন কথাই এই প্রাণশীল ফুলের সমতুল্য হতে পারে না। সমস্ত কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীকেই এক সময় প্রকাশের প্রাণ বিরহের মুখোমুখি হতে হয়।

ভাব বিনিময়ের এই দ্বিপাক্ষিকতা বিরাট লজিশিয়ান *ভিটগেনস্টাইন* খুব সরাসরি মানতেন। দর্শনের প্রতি তার মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্য রূপেই দর্শন লেখা উচিত। এই দর্শন কাব্যের প্রকাশ ভঙ্গি প্রশ্নে তিনি নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান সাধনাতে দ্রষ্টা মানব সত্তার ভূমিকা যাচাই করে বলছেন—

*নিজের ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যা বলা, নিজের ইচ্ছায় যা জাহির আছে তা নিয়ে নিজেকেই ধোকা দিলে তা প্রকাশ ভঙ্গিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তুমি তখন বুঝবেই না কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল প্রকাশ ভঙ্গি। . . . তুমি কি-তা যদি নিজেই জানতে না চাও, তবে তোমার লেখা এক রকমের প্রতারণা।*

সমস্ত জ্ঞান যখন কাব্য হয়ে ওঠে তখন মানব জ্ঞানের বিলিয়মান সীমারেখা বড় নশ্বর, বড় শক্তিমান, প্রতিনিয়তের আঘাত-সংঘাত, আশা আর স্বপ্নের কেন্দ্র মানুষকে সামনে তুলে ধরে। এই মানুষই কাব্যের সততা পরিমাপের মানদণ্ড। কলাকৈবল্যের বিচারে ফারায বহু আগেই উতরে গেছেন, এখন তাঁকে এই সততার বিচারে দেখলে আমাদের সম্যক লাভ হতে পারে।

জাভেদ হুসেন

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৯
*odhikarjvd@yahoo.com*

## অক্ষরান্তর-নির্দেশিকা

উর্দু অত্যন্ত ছন্দময় ভাষা, উচ্চারণ অত্যন্ত নাজুক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠক উর্দু শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে অনেকটা হসন্তযুক্ত চাপ দিয়ে উচ্চারণ চেষ্টা করতে পারেন। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মাত্রাভেদ স্পষ্ট। ব্যঞ্জন বর্ণে ফ = F, স = S, শ = Sh, জ = J, য = Z যেমন Measure-এ। ক, খ, গ এর ভিন্নতা শুনিয়ে বোঝানো ছাড়া উপায় নেই, তবে বাংলাতে বলিউডের যা বাড়বড়ন্ত সেটাই ভরসা। অধিকাংশ হিন্দি ছবির ভাষা কিন্তু হিন্দি নয়, বরং কথ্য উর্দু, যাকে অনেকে হিন্দুস্তানি বলেন।

# আহমদ ছফার কবিতা

## দবিচে

য়ে কিস্‌সা পুরানা হ্যায়
জাব বায্‌ হোটোঁ নে চাহা
কে লফ্‌যো কো আওয়াজ কি যিন্দেগি দে
তো খুদ্‌ উনকো যেহ্‌রে আব্‌ পিনা পড়া থা
কে এহ্‌লে হাকিম ইয়ে ডর্‌তা
য়ে আলফায
আওয়ায কি যিন্দেগি সে
কোঈ দাস্তান না বন যায়েঁ

অওর ও হোঁট চুপ হো গ্যায়ে থে
সিসক্‌তে তরপতে হুয়ে লফয্‌
কাতিল কি শমশির সে নিম জাঁ
মুদ্দতোঁ তক ফিরাক সদায়ে ধরকতে রহে হ্যায়

কিসে কেয়া খবর থি
কে ইন বিস্‌মিলো কা লহু. . . কাত্‌রা কাত্‌রা
লকিরোঁ কি সুরাত দমকতা রহেগা

অওর আব য়ে
লহু কি লকিরেঁ
বা জায়ে খুদ ইক দাস্তান বন গ্যায়ি হ্যায়

## প্রস্তাবনা

এ গল্প অনেক পুরোনো
যখন তোমার, আমার, আমাদের ঠোঁট
শব্দকে ধ্বনির প্রাণ দিতে চেয়েছিলো
তখন আমাদেরকেই বিষের পাত্রে চুমুক দিতে হয়েছে
বুদ্ধিমানেরা ভয় পেয়ে ভেবেছিলো
ধ্বনির প্রাণ পেয়ে এই শব্দ যদি গল্প হয়ে যায়?

তারপর সেই ঠোঁট নিথর হল
ঘাতকের ছুরির আঘাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ
সেই শব্দ হাহাকার করে উঠেছিল
কত শত যুগ একা গুমরে মরেছে বিরহী ডাক

কেউ কি জানতো
এই অর্ধমৃতদের রক্ত . . . বিন্দু বিন্দু জমে
রেখার রূপ হয়ে জ্বলে উঠবে!

সেই রক্তের রেখা
এখন নিজেই এক গল্প হয়ে উঠেছে

জুয্ তেরে কোঈ ভি দিন রাত না জানে মেরে
তু কাঁহা হ্যায় মাগার এ্যায় দোস্ত্ পুরানে মেরে

তু ভি খুশবু হ্যায় মাগার মেরা তজস্সুস বেকার
বর্গে আওয়ারা কি মানন্দ্ ঠিকানে মেরে

শাম্মা কি লও থি কে ও তু থা মাগার হিজ্র কি রাত
দের তক রোতা রাহা কোঈ সরহানে মেরে

হাম তো য়ুঁ খুশ থে কে ইক তার গরেবাঁ মে হ্যায়
কেয়া খবর থি কে বাহার ইস কে ভি আরমাঁ মে হ্যায়

ইক যরব্ অওর ভি এ্যায় যিন্দেগি তেশ বাদস্ত্
সাঁস্ লেনে কি সুকুত্ আব ভি মেরি জাঁ মে হ্যায়

সরে দিওয়ার ফরোযাঁ হ্যায় আভি ইক চারাগ
এ্যায় নাসিমে সেহরি! কুছ তেরে ইমকাঁ মে হ্যায়?

খল্কতে শেহের কে হর যুল্ম কে বাওস্ফ ফারায
হায়ে ও হাথ কে আপনে হি গরেবাঁ মে হ্যায়

আমার এই দিন, এই রাত কে জানে তুমি ছাড়া
কিন্তু কোথায় তুমি, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু

তুমিও সুগন্ধ, সে আমি জানি, তবু আমার সব খুঁজে ফেরা বৃথা
আমার ঠিকানা—সে তো ঝরে পড়া বিবাগী পাতার ঘর

প্রদীপের শিখা, না কি তুমি! —শুধু মনে পড়ে বিরহের রাতে
আমার শিয়রে বহুপ্রহর কে যেন গেছে কেঁদে

শত ছিন্ন উত্তরিয়র কিছু সুতো—ভেবে খুশিই ছিল মন
আমি কি জানতাম, বসন্ত তাও ছিনিয়ে নেয়ার সন্ধানে আছে

আরো একটা আঘাত, হে পাথরকাটা হাতের জীবন
দেখো, এখনো নিশ্বাস নেয়ার প্রশান্তি আমার প্রাণে বাকী রয়ে গেছে

সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটা মাত্র প্রদীপ আলো ছড়িয়ে যায়
ওহে ভোরের বাতাস, তুমি কি সে খবর রাখো?

এই শহরের বাসিন্দাদের সব নির্দয়তার পরও হে ফারায
আহা সে হাত! সে যে এখনো নিজের বুকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে

এ্যায়সে চুপ হ্যায় কে য়ে মন্‌যিল ভি কড়ি হো জ্যায়সে
তেরা মিল্‌না ভি জুদাঈ কি ঘড়ি হো জ্যায়সে

আপনে হি সায়ে সে হর গাম্‌ লরয্‌ জাতা হুঁ
রাস্‌তে মে কোঈ দিওয়ার খ্‌ড়ি হো জ্যায়সে

কিতনে নাঁদা হ্যায় তেরে ভুলনেওয়ালে কে তুঝে
য়াদ করনে কে লিয়ে উম্র পড়ি হো জ্যায়সে

তেরে মাথে কি শিকন পেহ্‌লে ভি দেখি থি মাগার
য়ে গির্‌হে আব কে মেরে দিল মে প্‌ড়ি হো জ্যায়সে

মন্‌যিলে দুর ভি হ্যায় মন্‌যিলে নয্‌দিক ভি হ্যায়
আপনে হি পাঁও মে যন্‌জির পড়ি হো জ্যায়সে

আজ দিল খোল্‌ কে রোয়ে হ্যায় তো য়ুঁ খুশ হ্যায় ফারায
চন্দ্‌ লম্‌হো কি য়ে রাহাত ভি ব্‌ড়ি হো জ্যায়সে

এমন নীরবতা চারদিকে, এই গন্তব্য বড় কঠোর যেন
তোমাকে পাওয়াও যেন বিরহের কাল

নিজেরই ছায়ার সাথে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ বাঁধে
পথের মাঝেই কোনও দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে যেন

তোমায় ভোলে যে জন, কত অবোধ তারা বলো
স্মরণ করে নিতে এক জীবন পড়ে আছে যেন

তোমার কপালের এই কুঞ্চন আগেও দেখেছি, তবে
এই গ্রন্থি এবার আমার হৃদয়ে দাগ ফেলে গেল যেন

গন্তব্য কাছেই ছিল, গন্তব্য দূরেও আছে
আমার নিজেরই পায়ে শেকল বাঁধা যেন

আজ মন খুলে কাঁদতে পেরে এত খুশি ফারায
দু'দণ্ডের এই অবসরই অনেক বড় যেন

## ইযহার

পাথার কি তর্‌হে আগার ম্যায় চুপ হুঁ
তো য়ে না সমঝ্ কে মেরে হস্‌তি
বেগানায়ে শোলায়ে ওয়াফা হ্যায়
তেহকির্ সে য়ুঁ না দেখ মুঝকো
এ্যায় সঙ্গ্ তারাশ! তেরা তেশ্
মুম্‌কিন হ্যায় কে যর্‌বে আউয়ালেঁ সে
পেহ্‌চান সকে কে মেরে দিল মে
জো আগ তেরে লিয়ে দ্‌বি হ্যায়
ও আগ হি মেরি যিন্দেগি হ্যায়

দিল বেহেলতা হ্যায় কাহাঁ আন্‌জুম ও মাহতাব সে ভি
আব্ তো হাম লোগ গ্যায়ে দিদায়ে বেখোয়াব সে ভি

রো পড়া হুঁ তো কোঈ বাত হি এ্যায়সি হোগি
ম্যায় কে ওয়াকিফ্ থা তেরে হিজ্র্ কে আদাব সে ভি

এ্যায় সমন্দর্ কি হাওয়া তেরা করম্‌ভি মালুম
পেয়াস সাহিল কি তো বুঝ্‌তি নেহি স্যায়লাব সে ভি

## প্রকাশ

পাথরের মত আমি যদি নিশ্চুপ থাকি
তবে ভেবে নিওনা আমার অস্তিত্ব
বিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ চেনে না
এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিওনা আমার দিকে
হে ভাস্কর! তোমার পাথরকাটা
হয়তো প্রথম আঘাতেই
বুঝে নেবে
আমার হৃদয়ে তোমার জন্য যে আগুন লুকোনো আছে
সেই আগুনই আমার জীবন

চাঁদ তারাতেও হৃদয় ভোলে না আর
আমরা কি স্বপ্নহীন দৃষ্টি থেকেও বঞ্চিত হলাম!

এমন আকুল হয়ে অকারণে তো কেঁদে উঠিনি
তোমার বিরহ কালের প্রথা সবই তো আমার জানা

ও সমুদ্রের হাওয়া, তোমার কৃপা হবে কবে!
কূলের পিপাসা তো শত প্লাবনেও মেটে না

## শিকস্ত্

বার্হা মুঝসে কাহা দিল নে কে এ্যায় শোবিদাগর
তু কে আলফায্ সে ইসনাম্গরি করতা হ্যায়
কাভি উস হুস্নে দিল আরা কি ভি তসবির বানা
জো তেরি সোচ্ কে খাকোঁ মে লহু ভরতা হ্যায়

বারহা দিল নে য়ে আওয়ায সুনি অওর চাহা
মান লুঁ মুঝসে জো ওয়ায্দান মেরা কেহ্তা হ্যায়
লেকিন ইস্ ইয্যে সে হারা মেরে ফ্ন কা জাদু
চাঁদ কো চাঁদ সে ব্ঢ় কার কোঈ কেয়া কেহতা হ্যায়

## পরাজয়

বারবার হৃদয় আমায় ডেকে বলে—হে কথার জাদুকর
তুমি যে শব্দ দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে যাও
সেই মনোহর সুন্দরের কখনো ছবি বানাও দেখি
যে তোমার ভাবনার অসার মৃত্তিকায় রক্ত সিঞ্চন করে

বারবার হৃদয় এই ডাক শুনে ভাবলো
বেশ, আমার স্রষ্টার কথা মেনে নিয়ে দেখি
কিন্তু এই সম্ভ্রমে হেরে গেল আমার কবিতার মায়াজাল
চাঁদকে আর কি নামে ডাকলে চাঁদের চেয়ে সুন্দর মনে হয়!

হর ইক বাত না কিঁউ যেহের্ সি হামারি লাগে
কে হামকো দস্তে যামানা সে যখ্মকারি লাগে

উদাসিয়া হো মুসল্সাল তো দিল নেহি রোতা
কভি কভি হো তো য়ে ক্যায়ফিয়াত ভি পেয়ারি লাগে

বাযাহির ইক হি শব হ্যায় ফিরাকে য়ার মাগার
কোঈ গুযার্নে ব্যায়ঠে তো উম্র সারি লাগে

ইলাজ ইস দিলে দর্দ্ আশনা কা কেয়া কিজে
কে তীর বন্কে জিসে হর্ফে গম্গুসারি লাগে

হামারে পাস্ ভি ব্যায়ঠো ব্স ইতনা চাহতে হ্যায়
হামারে সাথ তবিয়্যাত আগার তুমহারি লাগে

ফারায তেরে জুনুঁ কা খায়াল হ্যায় ওয়ার্না
য়ে কেয়া যুরুব ও সুরাত্ সভি কো পেয়ারি লাগে

আমার প্রতিটা শব্দ কেন গরল মনে হবে না
আমি যে পৃথিবীর হাতে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত

নিরন্তর বিষণ্ণতায় তো হৃদয় কাঁদে না
মাঝে মাঝে হলে এই নেশাও বেশ মিষ্টি লাগে

দেখতে গেলে প্রিয়র বিরহ তো একটা মাত্র রাত
সে রাত শেষ করতে চাইলে—এক জীবন কেটে যায়

দুঃখ চিনে নিয়েছে যে হৃদয় তার ঔষধ কি দিই
দুঃখ ভোলানোর প্রতিটা শব্দে যে সে তীরবিদ্ধ হয়

আমার পাশেও বোসো শুধু এটুকু চাই
আমার এই জগতে কিছু যদি আপন মনে হয় তোমার

ফারায! তোমার পাগলামির কথা ভেবেই কিছু বলি না
নয়তো সেই মুখ দেখে সবাই মুগ্ধ হবে—এও কি হয়!

সও দুরিয়োঁ পে ভি মেরে দিল সে জুদা না থি
তু মেরি যিন্দেগি থি মাগার বেওয়াফা না থি

দিল নে যারা সে গম কো কায়ামাত বানা দিয়া
ওয়ার্‌না ও আঁখ ইতনি যিয়াদা খা না থি

যুঁ দিল লরয্‌ উঠ্‌ঠা হ্যায় কিসি কো পুকার্‌ কার
মেরি স্‌দা ভি জেয়সে মেরি স্‌দা না থি

বর্গে খিযাঁ জো শাখ্‌ সে টুটা ও খাক্‌ থা
ইস জাঁ সুপুরদ্‌গি কে তো কাবিল হাওয়া না থি

জুগনু কি রওশ্‌নি সে ভি কেয়া কেয়া ভ্‌রক উঠ্‌ঠি
ইস শেহের কি ফাযাঁ কে চারাগ আশনাঁ না থি

মর্‌হুনে আস্‌মাঁ জো রহে উন্‌কো দেখ্‌ কার
খুশ হুঁ কে মেরে হোঁটো পে কোঈ দুয়া না থি

হর যিস্‌ম দাগ দাগ থা লেকিন ফারায হ্যাম
বদনাম যু হুয়ে কে বদন পে ক্‌বা না থি

শত দূরত্বেও আমার হৃদয় হতে বিচ্ছিন্ন ছিলে না
আমার জীবন হয়েও বিশ্বাস ভঙ্গ করোনি তুমি

এতটুকু দুঃখ থেকে হৃদয় প্রলয় জাগিয়ে তুললো
নয়তো সেই চোখে এমন গভীর কিছু কি ছিল!

এ কাকে ডেকে হৃদয় এমন কেঁপে উঠলো
আমারই ডাক আমি আমার কণ্ঠ বলে চিনতে পারিনি

হেমন্তের ঝরা পাতা ধুলোয় মিশে গেল
হাওয়া এমন প্রাণ সমর্পণের যোগ্য ছিল না

জোনাকির আলোতেও কত কি যে জ্বলে উঠলো
এই শহরের প্রতিবেশ দেখি প্রদীপ দেখেনি কখনো

ঐ দুনিয়ার কাছে যারা বন্ধক পড়ে আছে, তাদের দেখে
আমার ঠোঁট প্রার্থনাহীন, এতে দুঃখ নেই মোটে

সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ছিলো ফারায, আর
শরীর নগ্ন রাখার অপবাদ সইতে হল শেষ কালে

এ্যায় খুদা জো ভি মুঝে পন্‌দে শ্‌কেবানি দে
উস কি আঁখো কো মেরে যখম্‌ কি গ্যাহ্‌রায়ি দে

তেরে লোগো সে গিলা হ্যায় মেরে আঙ্গনোঁ কো
উন কো পাথার নেহি দেতা হ্যায় তো বিনায়ি দে

জিস কে ইমাঁ পে কিয়া তর্‌কে তালুক সব সে
আব ওহি শখ্‌স মুঝে তানায়ে তান্‌হায়ি দে

য়ে দেহেন যখ্‌ম কি সুরাত হ্যায় মেরে চেহ্‌রে পর
য়া মেরে যখ্‌ম কো ভর য়া মুঝে গোয়ায়ি দে

ইতনা বে সর্‌ফা না জায়ে মেরে ঘর কা জ্বল্‌না
চশ্‌মে গিরিয়া না সহি চশ্‌মে তামাশায়ি দে

কেয়া খবর তুঝ কো কে কিস ওজহে্‌ কা বিস্‌মিল হ্যায় ফারায
ও তো কাতিল কো ভি ইল্‌যামে মসিহায়ী দে

হে ঈশ্বর যত ইচ্ছে আমায় ধৈর্যের উপদেশ দাও
শুধু সেই চোখকে আমার আঘাতের গভীরতা দাও

তোমার মানুষের কাছে অভিযোগ প্রার্থী আমার আয়না
তাদের পাথর যদি না দেবে, দেখার দৃষ্টি দাও

যাকে বিশ্বাস করে সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আছি
এখন সে-ই আমার নিঃসঙ্গতা নিয়ে পরিহাস করে

আঘাতের রূপ নিয়ে আছে আমার চেহারায় এই রসনা
এই ক্ষত পূর্ণ করে না দেবে যদি বলার ভাষা দাও

আমার ঘর এমনই বৃথা জ্বলে জ্বলে ছাই হবে?
জল ভর্তি চোখ না হোক তামাশা দেখার চোখ দাও

কি কারণে মুমূর্ষু ফারায, তুমি তার কি জানো!
সে তো ঘাতককেও প্রাণ দানের অপবাদ দেয়

## খোয়াব মরতে নেহি

খোয়াব মর্‌তে নেহি
খোয়াব দিল হ্যায় না আঁখে না শামে কে জো
রেযা রেযা হুয়ে তো বিখার্‌ জায়েঙ্গে
জিস্‌ম কি মওত সে য়ে ভি মর্‌ জায়েঙ্গে

খোয়াব মর্‌হে নেহি
খোয়াব তো রওশ্‌নি হ্যায় নওয়া হ্যায়
জো কালে পাহাড়োঁ সে রুক্‌তে নেহি
মক্‌তলোঁ মে পহুঁচ্‌ কার ভি ঝুক্‌তে নেহি

খোয়াব তো হর্ফ্‌ হ্যায়
খোয়াব তো নুর হ্যায়
খোয়াব সুকরাত হ্যায়
খোয়াব মনসুর হ্যায়

## স্বপ্ন মরে না

স্বপ্ন হৃদয় নয়, আনত দৃষ্টি কি সন্ধ্যা নয় জেনো
টুকরো টুকরো হলেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় না
শরীরের মৃত্যুতে স্বপ্নের কি আসে যায়!

স্বপ্ন মরে না
স্বপ্ন তো আলো, স্বপ্ন বুকের মাঝে সুর
কালো পাহাড়ের দেয়াল কবে তার পথ রুখতে পারে!
ফাঁসিকাঠে চড়েও স্বপ্ন মাথা নোয়ায় না

স্বপ্ন তো অক্ষর
স্বপ্ন আলো
স্বপ্ন সক্রেটিস
স্বপ্ন মনসুর হাল্লাজ

সব লোগ লিয়ে সংগ-এ মালামাত্ নিকাল আয়ে
কিস শেহের মে হাম অ্যাহ্‌লে মুহাব্বাত নিকাল আয়ে

হর ঘর কা দিয়া গুল না করো তুম কে না জানে
কিস বাম সে খুর্‌শিদে কায়ামাত নিকাল আয়ে

জো দর্‌প্যায়ে পিন্দার্ হ্যায় উন কত্‌লগাহো সে
জাঁ দে কে ভি সমঝো কো সালামাত্ নিকাল আয়ে

য়ারো মুঝে মস্‌লুব করো তুম কে মেরে বাদ
শায়েদ কে তুম্‌হারা কদ্ ও কামাত নিকাল আয়ে

দিল গিরিফ্‌তা হি সহি বয্‌ম সাজালি জায়ে
য়াদে জানাঁ সে কোঈ শাম না খালি জায়ে

রাফ্‌তা রাফ্‌তা য়েহি জিন্দাঁ মে বদল জাতে হ্যায়
আব কিসি শেহের কি বুনিয়াদ না ডালি জায়ে

বে ন্ওয়া শেহের কা সায়া হ্যায় মেরে দিল্‌পে ফারায
কিস তরহে সে মেরি আশুফ্‌তা খায়ালি জায়ে

অপবাদের পাথর হাতে ঘিরে ধরেছে সবাই
আমরা প্রেমের পথিক এ কোন শহরে এসে পৌঁছলাম

সব ঘরের প্রদীপ অমন করে নিভিয়ে দিও না,
কোন অলিন্দ হতে প্রলয়ের সূর্য উদয় হবে কে জানে

এই বধ্যভূমির প্রতি পদক্ষেপে উপদেশের ফুলঝুরি
এখানে প্রাণ দিয়েও ভেবে নিয়ো প্রাণ রক্ষা পেলো

বন্ধুরা আমার সব ছিনিয়ে নাও, হয়তো আমার পর
তোমরা আপন উচ্চতা খুঁজে পাবে

হৃদয় না হয় বন্দী, তাতে কি, আসর রঙিন সাজে সাজিয়ে নাও
প্রিয়ের স্মরণ বঞ্চিত কোন সন্ধ্যা যেন বিফল না যায়

একটু একটু করে এগুলোই সব কারাগার হয়ে যায়
আর যেন কোন নতুন শহরের ভিত্তি তৈরি না হয়

সুরহীন কর্কশ শহরের গ্রহণে ছেয়েছে আমার হৃদয় ফারায
আমার ভাবনার পাগলামো বলো কেমন করে কাটে

হর তামাশায়ি ফক্‌ত সাহিল সে মন্‌যর দেখতা
কৌন্‌ দরিয়া কো উলট্‌তা কৌন্‌ গওহর্‌ দেখতা

ও তো দুনিয়া কো মেরি দিওয়ান্‌গি খুশ আ গ্যায়ি
তেরে হাথো মে ওগর্‌না পেহ্‌লা পাত্থার দেখতা

আঁখ মে আঁস্‌ু জড়্‌ে থে পর স্‌দা তুঝ কো না দি
ইস তাওয়াক্কো পর কে শায়েদ তু পলট কার দেখতা

যিন্দেগি ফ্যায়লি হুয়ি থি শামে হিজরাঁ কি তারহা
কিসে ইতনা হওস্‌লা থা কৌন্‌ জি ক্‌র দেখতা

ডুবনে ওয়ালা থা অউর সাহিল পে চেহ্‌রো কা হুজুম্‌
পল কি মোহ্‌লাত্‌ থি ম্যায় কিসকো আঁখ ভ্‌র কার দেখতা

তু ভি দিল কো ইক লহু কি বুন্দ্‌ সাম্‌ঝা হ্যায় ফারায
আঁখ আগার হোতি তো ক্‌ত্‌রে মে সমন্দার দেখতা

সব নীরব দর্শক শুধু কূল হতে তামাশা দেখে
সমুদ্র উলটে নিয়ে সেই মুক্তোর খোঁজ করতো কে

ভাগ্যিস আমার আত্মহারা ভাব পৃথিবীর ভালো লেগে গেল
নয়তো তোমার হাতেই প্রথম পাথর দেখতে পেতাম

কত অশ্রু জমে ছিল চোখে তবু তোমায় দিই নি সাড়া
আশা ছিল তুমি হয়তো ফিরে তাকাবে কখনো

বিরহ সন্ধ্যার মত দিগ্বিদিক্ ছড়িয়ে ছিল জীবন
কার ছিল এতো ধৈর্য্য, কে বেঁচে থাকতো তার প্রান্তের খোঁজে?

ডুবছি যখন, কূলে অজস্র চেহারার ভিড়
এক মুহূর্তের সময়—আমি কাকে দু'চোখ ভরে দেখতাম

তুমিও হৃদয়কে এক বিন্দু রক্ত মাত্র ভাবলে ফারায!
দৃষ্টি যদি থাকতো তবে বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে পেতে

জিস্‌ম শোলা হ্যায় জভি জামায়ে সাদাহ্‌ পেহ্‌না
মেরে সুরজ নে ভি বাদল কা লিবাদা পেহ্‌না

সিল্‌ওটে হ্যায় মেরে চেহ্‌রে পে তো হ্যায়রাত কিউঁ হো
যিন্দেগি নে মুঝে কুছ তুম সে যিয়াদা পেহ্‌না

খোয়াহিশেঁ য়্যুঁ হি বর্‌হানা হো তো জ্বল্‌ বুঝতি হ্যায়
আপনি চাহাত কো কভি কোঈ ইরাদা পেহ্‌না

য়ারে প্যায়মা শিকন আয়ে আগার আব কে তো উসে
কোঈ যন্‌জিরে ওয়াফা এ্যায় শবে ওয়াদা পেহ্‌না

ফকিহায়ে শেহের কি মজলিশ সে কুছ ভালা না হুয়া
কে উস সে মিল কর মিজায অওর কাফিরানা হুয়া

আভি আভি ও মিলা থা হাযার বাতেঁ কি
আভি আভি ও গ্যায়া হ্যায় মাগার যামানা হুয়া

ও রাত ভুল জাও ও সুখান না দোহ্‌রাও
ও রাত খোয়াব হুয়ি ও সুখান ফাসানা হুয়া

শহিদে শব্‌ ফক্‌ত এহ্‌মেদ ফারায হি তো নেহিঁ
কে জো চারাগ বাকাফ্‌ থা ওহি নিশানা হুয়া

শুভ্র পোশাক অঙ্গে জড়াতেই দেখি সে শরীর আগুনের মত রঙিন
আমার সূর্যও দেখছি মেঘের চাদর জড়িয়েছে গায়ে

আমার মুখের বলি রেখা দেখে এত অবাক কেন হলে
তোমার চাইতে আমাকে জীবন একটু বেশিই পরেছে

বাসনা অকস্মাৎ বেড়ে গেলে দপ্ করে জ্বলে নিভে যাবে
তোমার চাওয়াকে কোন আকাংক্ষার পোশাক পরিয়ে দাও

কথা দিয়ে ভুলে যায়—সে বন্ধু এবার যদি আসে
তবে হে প্রতিশ্রুতির রাত, তাকে বিশ্বাসের শেকল পরিয়ে দিও

ধর্মগুরুদের সভায় গিয়ে কোন লাভ হল না আমার
সেই সাক্ষাতে দেখি মেজাজ আরো অবিশ্বাসী হয়েছে

একটু আগে তার দেখা পেলাম, কত শত কথা হলো
একটু আগেই বিদায় নিলো সে, যেন শত বর্ষ হয়ে গেছে

সেই রাত ভুলে যাও, সেই কবিতা গুনগুন করো না আর
সেই রাত স্বপ্ন হয়ে গেছে, সেই কবিতা আজ গল্প

রাতের অন্ধকারের হাতে শহীদ আহমদ ফারায একাই তো নয়
যাদের হাতে প্রদীপ ছিল, সবাই তার লক্ষ্য হয়েছে

## সচ কা য্যাহের

তুঝে খবর ভি নেহি
কে তেরি উদাস অধুরি
মুহব্বাতোঁ কি কাহানিয়া
জো বড়ি কুশাদা দিলি সে
হস্‌ঁ হস্‌ঁ কে সুন রাহা থা
ও শক্‌স তেরি সদাকাতো পর ফারেফ্‌তা
বা ওয়াফা সাবিত কদম
কে জিস কি জবি পে
যালিম রকাবতোঁ কি জ্বলন সে
কোঈ শিকন আয়ি
ও যবত্‌ কি শিদ্দত্‌ সে
দিল হি দিল মে
খামোশ, চুপ চাপ
মর গ্যায়া হ্যায়

## সত্যের গরল

তুমি জানতেই পারলে না
তোমার আধো উদাস
প্রেমের গল্প
হৃদয় উজাড় করে
হাসি মুখে শুনছিলো যে
তোমার নিষ্পাপ মুখচ্ছবিতে বিমোহিত
বিশ্বাসের স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখে
যার কপালে
প্রতিদ্বন্দ্বের নির্দয় জ্বলন
কুঞ্চন এঁকে দিয়ে গেল—
নিজেকে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণায়
মনে মনে
নিশ্চুপ, নীরব
মরে গেছে সে

আঁখ সে দুর না হো দিল সে উতার জায়েগা
ওয়াক্ত্ কা কেয়া হ্যায় গুযার্‌তা হ্যায় গুযার্ জায়েগা

ইতনা মানুস না হো খিল্‌ওতে গম সে আপনি
তু কাভি খুদ কো ভি দেখেগা তো ডর জায়েগা

তুম স্‌রে রাহে ওয়াফা দেখতে রেহ্ জাওগে
অওর ও বাবে রাফাকাত্ সে উতার জায়েগা

ডুবতে ডুবতে কাশ্‌তি তো উছালা দে দুঁ
ম্যায় নেহি কোঈ তো সাহিল পে উতার জায়েগা

যিন্দেগি তেরি আতা হ্যায় তো য়ে জানেওয়ালা
তেরি বখশিশ তেরি দেহলিয্ পে ধর্ জায়েগা

যব্‌ত লাযিম হ্যায় মাগার দুখ হ্যায় কায়ামাত কা ফারায
যালিম আব কে ভি না রোয়েগা তো মর জায়েগা

দৃষ্টি থেকে দূরে যেও না, মন থেকে সরে যাবে তুমি
সময় থেমেছে কবে! কেটে যায়, কেটে যাবে

নিজের নির্জন দুঃখকে এতো ভালবাসতে যেয়ো না
কোন দিন নিজেকে দেখেই ভয় পাবে তুমি

বিশ্বাসের দীর্ঘ পথে তুমি তাকিয়ে রয়ে যাবে
আর সে পরিচয়ের দুয়ার পেরিয়ে যাবে দূরে

ডুবতে ডুবতে নৌকো একটু উছলে দিয়ে যাই
আমি নই, অন্য কেউ তো কূলে পৌঁছে যাবে

এ জীবন তোমার কৃপা যদি হয়, তবে হে বিদায়ী বন্ধু
তোমার উপহার তোমারই চৌকাঠে ফিরিয়ে দেব আমি

নিজেকে সামলে রাখা ভালো, কিন্তু ফারায, দুঃখ যে প্রলয়ব্যাপী
ওহে নির্দয়, এখনো যদি না কাঁদো কি করে বাঁচবে তুমি!

সেহ্‌রা তো বুন্দ্‌ কো ভি তরস্‌তা দিখায়ি দে
বাদল সমন্দরো পর বরস্‌তা দিখায়ি দে

ইস শেহ্‌রে গম কো দেখ কর দিল ডুবনে লাগা
আপনে পে হি সহি, কোঈ হাঁস্‌তা দিখায়ি দে

এ্যায় সদ্‌রে বয্‌মে ম্যায় তেরি সাকিগরি কি খ্যায়র
হর দিল বিসানে শিশা শিকস্তা দিখায়ি দে

গর ম্যায় নেহি তো যেহের হি লাও কে ইস তরহে
শায়েদ কোঈ নাজাত কা রাস্তা দিখায়ি দে

এ্যায় চশ্‌মে য়ার তু ভি তো কুছ দিল কা হাল খোল
হাম কো তো য়ে দায়ার না বাস্‌তা দিখায়ি দে

জিনসে হুনার কো কোঈ খরিদ্‌দার হ্যায় ফারায
হীরা, পাথরোঁ সে ভি সস্‌তা দিখায়ি দে

৩৬

এই মরুভূমি দেখি একটা বিন্দুর জন্যও কাতর
আর মেঘ দেখি সমুদ্রের বুকে বৃষ্টি ঝরিয়ে যায়

এই দুঃখের শহর দেখে হৃদয় ভারি হয়ে ওঠে
আমাকে নিয়ে বিদ্রুপেও কেউ যদি হেসে উঠতো

ও পান আসরের প্রধান, তোমার পরিবেশনের বলিহারি
প্রতিটা হৃদয় যে কাঁচের পান পাত্রের মত ভেঙে ছড়িয়ে আছে

যদি কারণসুধা না হয় তবে বিষই নিয়ে এসো
হয়তো এমন করেই কোন নির্বাণের পথ দেখা যাবে

ও প্রিয়'র চোখ, তুমিই না হয় কিছু মনের কথা বলো
এই আঙিনা তো দেখি একটুও মন টানে না

তোমার এই কাব্যগুণের কোন খরিদ্দার পাওয়া ভার, হে ফারায
এখানে যে হীরের টুকরো কাচের চেয়ে শস্তা মনে হয়

য়ে কেয়া কে সব সে বয়াঁ দিল কি হালতেঁ ক্‌রনি
ফারায তুঝ কো না আয়েঁ মুহাব্বতেঁ ক্‌রনি

য়ে কুর্‌ব্‌ কেয়া হ্যায় কে তু সামনে হ্যায় অওর হামেঁ
শুমার আভি সে জুদাঈ কি সা-আতেঁ ক্‌রনি

হাম আপনে দিল সে হ্যায় মজবুর অওর লোগোঁ কো
যারা সি বাত পর বর্‌পা কায়ামাতে ক্‌রনি

মিলেঁ জাব উনসে তু মুবহাম্‌ সি গুফ্‌তাগু করনা
ফির আপনে আপ সে সও সও ওয়াজাহাতেঁ ক্‌রনি

য়ে লোগ ক্যায়সে মাগার দুশমনি নিভাতে হ্যায়
হামে তো রাস্‌ না আয়েঁ মুহাব্বাতেঁ ক্‌রনি

কাভি ফারায ন্‌য়ে মওসমোঁ মে রো দেতা
কাভি তালাশ পুরানি রাফাকাতেঁ ক্‌রনি

সবার কাছে হৃদয়ের সাতকাহন, এ কেমন স্বভাব তোমার!
ফারায, প্রেম করা আর শিখলে না তুমি

এ কেমন কাছে পাওয়া, তুমি সামনে আছো আর আমি
এখনই বিরহের দিনরাত গুণতে শুরু করেছি

আমি আমার হৃদয়ের কাছে অসহায় হয়ে আছি আর সবাই
সামান্য কথায় প্রলয় তোলার অপেক্ষায় বসে আছে

তার দেখা পেলে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া সব আলাপচারিতা
তারপর নিজের কাছেই নিজে শত শত কারণ দর্শানো

এসব লোকেরা কেমন করে শত্রুতা জিইয়ে রাখে
আমি তো ভালোবাসাতেই অভ্যস্ত হতে পারলাম না

নতুন মওসুমে কখনো ফারাযের সেই কেঁদে ওঠা
কখনো সেই কবেকার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্বের খোঁজ

## মর্সিয়া

ও যখ্ম ইন্তেযার কি লয্যত ভি লে গ্যায়া
আব নামাবর কি রাহ্ না দেখা করেঙ্গে হাম
ও কিস তর্হে মিলা থা জুদা ক্যায়সে হো গ্যায়া
সোচা থা য়ে সওয়াল না সোচা করেঙ্গে হাম
এ্যায় যিন্দেগি জাব উস সে ওয়াফা কর সকি না তু
ফির তু বাতা কে তুঝসে ওয়াফা কেয়া করেঙ্গে হাম

ওয়েহশতে বাঢ়্তি গ্যাযি হিয্র্ কে আযার কে সাথ
আব তো হাম বাত ভি করতে নেহি গম খোয়ার কে সাথ

ইক তো খোয়াব লিয়ে ফিরতে হো গলিয়োঁ গলিয়োঁ
উস পে তক্রার ভি করতে হো খরিদ্দার কে সাথ

জ্যো শর্ফ্ হাম কো মিলা কুচায়ে জানাঁ সে ফারায
সুয়ে মক্তল ভি গ্যায়ে হ্যায় উঁসি পিন্দার কে সাথ

## শোকগাথা

সে ক্ষত অপেক্ষার মহিমাটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে গেল
আর কেন পত্রবাহকের পথ চেয়ে থাকবো আমি
কেমন করে পেয়েছিলাম তাকে, কেমন করে হারালো
ভেবেছিলাম এই প্রশ্ন নিয়ে ভাববো না আর
ও জীবন! যখন তার সাথে প্রতিশ্রুতি ভাঙলে তুমি
তবে তুমিই বলো—তোমার সাথে কেমন করে কথা রাখি

নিসঃঙ্গতা বেড়ে চলেছে বিরহব্যাধির সাথে
দুঃখহারীর সাথে আমি এখন কথাই বলি না

একে তো স্বপ্ন ফেরি করো অলিতে গলিতে
তার ওপর তর্ক জুড়ে দিলে খরিদ্দারের সাথে

প্রিয়'র গলি থেকে এই আত্ম-অভিমান পেয়েছি ফারায
সেই উপদেশ সাথে নিয়ে বধ্যভূমির পথেও হেঁটেছি

না মনযিলোঁ কো না হাম রাহ্‌গুযার কো দেখতে হ্যায়
আজব সফর হ্যায় হ্যায় কে বাস্ হাম্‌সফর কো দেখতে হ্যায়

তেরে জামাল সে হট্ ক্‌র ভি ইক দুনিয়া হ্যায়
য়ে স্যায়রে চশম মাগার কব উধার কো দেখতে হ্যায়

আজব ফসুনে খরিদ্‌দার কা আসর হ্যায় কে হাম
উসি কি আখোঁ সে আপ্‌নে হুনার কো দেখতে হ্যায়

কোঈ মাকাঁ কোঈ যিন্দাঁ সামাঝ কে রেহ্‌তা হ্যায়
তিলিস্‌মে খানায়ে দিওয়ার ও দর্ কো দেখতে হ্যায়

ও বেখবর মেরি আখোঁ কা সব্‌র ভি দেখেঁ
জো তন্‌জ সে মেরে দামানে তর্ কো দেখতে হ্যায়

হামারি দর বদরি কা য়ে মাজ্‌রা হ্যায় কে হাম
মুসাফিরোঁ কি তর্‌হে আপনে ঘর কো দেখতে হ্যায়

না গন্তব্য না পথের পানে তাকাই
এই অদ্ভুত যাত্রা! শুধু পথসঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকি আমি

তোমার রূপ শোভা ছাড়াও আরেক পৃথিবী আছে জানি
এই ভ্রমণ পিয়াসী চোখ কি ভুলেও সেদিকে তাকায়!

খরিদ্দারের একি আজব জাদু পড়লো আমার ওপর
আমি যে তাদের দৃষ্টিতেই নিজের দিকে তাকাই

কেউ ঘর কেউ বা কারাগার ভেবে বাস করে
আর আমি এই চার দেয়ালের রহস্য দেখি দু'চোখ ভরে

সেই উদাসীন আমার চোখের তিতিক্ষার দিকেও তাকাক
সে তো ভর্ৎসনা ভরা দৃষ্টিতে আমার ভেজা উত্তরীয় দেখলো শুধু

দ্বারে দ্বারে আমার ঘুরে বেড়ানোর রহস্য এই
পথিকের মত আমি আমারই ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকি

ম্যায় মর্ মিটা তো ও সাম্‌ঝা য়ে ইন্‌তিহা থি মেরে
উসে খবর হি না থি, খাক কিমিয়া থি মেরি

জো তানা যন্ থা মেরি পোশিশে দরিদা পর
উসি কে দোশ্ পে রখ্‌খি হুয়ি ক্বাবা থি মেরি

ম্যায় উস কো য়াদ করুঁ ভি তো য়াদ আতা নেহি
ম্যায় উস কো ভুল গ্যায়া হুঁ, য়েহি সাযা থি মেরি

ম্যায় চুপ হুয়া তো ও সামঝা কে বাত খতম্ হুয়ি
ফির উস কে বাদ তো আওয়ায যা বাজা থি মেরি

কাঁহি দিমাগ, কাঁহি দিল কাঁহি বদন হি বদন
হর ইক সে দোস্‌তি য়ারি জুদা জুদা থি মেরি

কোঈ ভি কুয়ে মুহাব্বাত সে ফির নেহি গুযরা
তো শেহ্‌রে ইশ্‌ক মে কেয়া আখ্‌রি স্‌দা থি মেরি

ম্যায় উস কো দেখতা রেহতা থা হ্যায়রতোঁ সে ফারায
য়ে যিন্দেগি সে তাআরুফ কি ইব্‌তিদা থি মেরি

আমার মৃত্যুর পর সে ভেবেছিল এই আমার সমাপ্তি
সে জানতোই না আমার অবশেষ ধূলিও অমৃত

আমার শতচ্ছিন্ন বসন দেখে শ্লেষ করছিল যারা
তাদের কাঁধেই রাখা দেখো আমার জামা

মনে করতে চাইলেও স্মরণে আসে না সে
ভুলে গেছি তাকে, এই আমার সাজা

আমি চুপ হলাম, সে ভাবলো সব কথা শেষ
তারপর তো প্রতিটি কোণে শুধু আমারই কণ্ঠস্বর

কোথাও সৃজন, কোথাও হৃদয় কোথাও বা শুধুই শরীর
সবার সাথেই সখ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ছিল আমার

প্রেমের গলিপথ দিয়ে আর কেউ যে এলো না
প্রেমের শহরে যে শেষ ডাকের প্রতিধ্বনি—সে কি আমার!

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম ফারায
সে ছিল আমার জীবনকে চেনার হাতেখড়ি

কুছ হাম হি উস সে জান কার না খুলে
হাম পে সব ভেদ থে ওগরনা খুলে

জি মে কেয়া কেয়া থি হস্‌রতে পরওয়ায
জাব রিহায়ি মিলি তো পর্‌ না খুলে

আগে খোয়াহিশ থি খুন রোনে কি
আব য়ে মুশকিল কে চশ্‌মে তর্‌ না খুলে

হো তো এ্যায়সি হো পর্দাদারিয়ে যখ্‌ম
হাল দিল কা ভি আঁখ পর্‌ না খুলে

সখ্‌ত তানহা থে উসকি বয্‌ম মে হাম
রংগে মেহফিল কো দেখ কার না খুলে

কিতনে খুশ হো ফারায আসিরি পর
অওর য়ে বন্দে গম আগার না খুলে?

কিছুটা জেনে বুঝেই নিজেকে নিশ্চুপ রেখেছি আমি
নয়তো সব গোপন কথাই আমার জানা ছিলো

কেমন সব উড়ে বেড়ানোর বাসনা ছিল মনে
মুক্ত হয়ে দেখি আমার ডানা মেলে না আর

আগে আকাঙ্ক্ষা ছিল রক্ত অশ্রু রোদনের
আর এখন বড় জ্বালা, ভেজা চোখ যে খোলে না

ক্ষতকে আড়াল রাখার এমন দক্ষতা চাই
হৃদয়ের হালও যেন চোখে ধরা না পড়ে

বড় নিষ্করুণ নিঃসঙ্গ ছিলাম তোমার সভায় আমি
তবে আসরের রঙ দেখে নিশ্চুপ রয়ে গেলাম

নিজের কাঙালপনায় কতো খুশি তুমি ফারায!
আর এই দুঃখের বন্দনা যদি কখনো না ছোটে?

জো ভি কাসিদ থা ও গ্যায়রোঁ কে ঘরোঁ তক পহুঁচা
কোঈ নামা না তেরে দর বদরোঁ তক পহুঁচা

মুঝ কো মিট্টি কিয়া তুনে তো য়ে ইহ্সান ভি কর
কে মেরি রাখ্ কো আব কুযাগরোঁ তক পহুঁচা

তু মাহ্ ও মেহের লিয়ে হ্যায় মাগার এ্যায় দস্তে করিম
কোঈ জুগ্নু ভি না তারিক ঘরোঁ তক পহুঁচা

এ্যায় খুদা! সারি মাসাফাত থি রাফাকাত্ কে লিয়ে
মুঝকো মন্যিল কি জা হাম্সফরোঁ তক পহুঁচা

ইত্নে নাসেহ্ মিলে রাস্তে মে কে তওবা তওবা
বড়ি মুশকিল সে ম্যায় শোরিদা সরোঁ তক পহুঁচা

এ্যাহ্লে দুনিয়া নে তুঝি কো নেহি লুটা হ্যায় ফারায
জো ভি থা সাহিবে দিল, মুফ্ত বরোঁ তক পহুঁচা

যত পত্রবাহক, সব পরের ঘরে গেল
তোমার খোঁজে যারা ঘরহীন তাদের জন্য কোন বার্তা এলো না

আমায় ধুলো করলে যদি তবে এটুকু কৃপাও কর
আমার অবশিষ্ট একমুঠো ছাই কুম্ভকারের কাছে পৌঁছে দাও

তুমি চন্দ্র সূর্য হাতে নিয়ে আছো কিন্তু হে দয়ার সাগর
অন্ধকার ঘরগুলোতে একটা জোনাকির আলোও জ্বললো না

হে ঈশ্বর! এসব অস্থিরতা তো বন্ধু সাহচর্যের আশে
গন্তব্য কে চায়! তুমি আমায় পথ সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও

এতো উপদেশদাতার সামনে পড়লাম পথে, তওবা তওবা
বড় কষ্ট করে তোমার ক্ষ্যাপাদের কাছে পৌঁছলাম

জগৎবাসী শুধু তোমাকেই সর্বস্বান্ত করেনি হে ফারায
যাদের বুকেই স্পন্দিত হৃদয় ছিল, সবাই তাদের শিকার

হাম কে মিন্নাত কশে সাইয়াদ নেহি হোনে কে
ও জো চাহে ভি তো আযাদ নেহি হোনে কে

য়ারে বদ এহেদ্ কা কিতনা বড়া ইহসাঁ হ্যায় কে হাম
আব কিসি কে লিয়ে বর্বাদ নেহি হোনে কে

ইস যফা খুঁ কো দুআ দো কে আগার ও না রাহা
ফির কিসিসে সিতম ইযাদ নেহি হোনে কে

ওয়াস্‌ফে ম্যায় অওর সফ্‌তে য়ার কে মযমুন কে সিওয়া
নাসেহা! তেরে সুখান য়াদ নেহি হোনে কে

দেখ আ কার কাভি উন কো ভি জো তেরে হাথো
এ্যায়সে উজ্‌ড়ে কে আবাদ নেহি হোনে কে

ইতনে আরাম তলব হো তো মুহাব্বাত মে ফারায
মীর বন জাওগো ফরহাদ নেহি হোনে কে

আমি যে ব্যাধের কাছে মিনতি জানাতে প্রস্তুত নই
সে চাইলেও আমি মুক্ত হবো না

সে অবিশ্বাসী প্রিয়'র বড় কৃপা হে আমার ওপর
আর কারোর জন্য সর্বস্বান্ত হতে হবে না আমায়

সেই স্বভাব অবিশ্বাসীকে আশির্বাদ জানাও, যদি সে নাই থাকে
এত নিষ্ঠুরতার অবাধ প্রবাহ আর আসবে কোথা হতে

সুরার প্রশস্তি আর বন্ধুদের নির্বুদ্ধিতা সামনে না থাকলে
হে উপদেশ দাতা! তোমার প্রলাপ ভুলেও মনে পড়ে না

কখনো তাকেও দেখে যেও যে তোমারই হাতে
এমন উজাড় হয়ে আছে, আবাদ হবে না আর

এমন আয়েশ লোভি হলে প্রেমের পৃথিবীতে ফারায
মীর হয়ে যাবে, ফরহাদ হওয়া হবে না আর

চলো কে কুচায়ে দিলদার চল কে দেখতে হ্যায়
কিসে কিসে হ্যায় য়ে আযার চলকে দেখতে হ্যায়

হাম আপনে বুত কো, যুলেখা লিয়ে হ্যায় য়ুসুফ কো
হ্যায় কওন রওনকে বাযার চলকে দেখতে হ্যায়

সুনা হ্যায় দ্যায়র ও হ্‌রম্‌ মে তো ও নেহি মিলতা
সো আব্‌কে উসকো স্‌রে দার চলকে দেখতে হ্যায়

ফারায আসির হ্যায় উসকা কে ও ফারায কা হ্যায়
হ্যায় কওন্‌ কিসকা গিরিফতার? চলকে দেখতে হ্যায়

উস নে সুকুতে শব্‌ মে ভি আপনা পায়াম রাখ্‌ দিয়া
হিজ্র কি রাত বাম পর মাহে তামাম রাখ্‌ দিয়া

আমদে দোস্‌ত কি নাবিদ কুয়ে ওয়াফা মে আম থা
ম্যায় নে ভি ইক চারাগ সা দিল সরে শাম রাখ দিয়া

দেখো য়ে মেরে খোয়াব থে দেখো য়ে মেরে যখম হ্যায়
ম্যায় নে তো সব হিসাবে জাঁ বর্‌ সরে আম রাখ দিয়া

শিদ্দাতে তশ্‌নগি মে ভি গ্যায়রতে ম্যায়কশি রহি
উস নে জো ফের লি নযর ম্যায় নে ভি জাম রাখ দিয়া

চলো সহৃদয় প্রিয়তমের গলিতে গিয়ে দেখে আসি
আর কার, কত জনের হল এ অসুখ দেখে আসি

আমি আমার পাষাণ প্রতিমাকে, জুলেখা নিয়ে চলুক তার য়ুসুফ
গিয়েই দেখে আসি, কে হয় আজ বাজারের শোভা

শুনেছি মন্দির মসজিদে তাঁকে পাওয়া যায় না
এবার বরং ফাঁসি কাঠ পর্যন্ত গিয়ে তাকে দেখে আসি

ফারায তার কাঙাল, নাকি সে কাঙাল ফারাযের
কে কার হাতে বন্দী, চলো গিয়ে দেখে আসি

সুনশান রাতের নীরবতা, তবু সে তার বারতা গেছে রেখে
বিরহ রাতে মাথার ওপর পূর্ণ চাঁদ রেখে গেছে

বন্ধুর আগমন সুসমাচার বিশ্বাসের গলিতে রটে গেল
আমিও এক প্রদীপের মত সন্ধ্যার প্রান্তে জ্বালিয়ে দিয়েছি হৃদয়

দেখো এই ছিল আমার স্বপ্ন, দেখো এই আমার ক্ষত
আমি তো প্রাণের কড়া-ক্রান্তি সবার সামনে মেলে রেখেছি

পিপাসার যন্ত্রণার মাঝেও পিপাসা মেটাবার অহঙ্কার ভুলে যাইনি
সে যখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, আমিও পানপাত্র নামিয়ে রেখেছি

মুনতাযির কাব সে তাহাঈয়ুর হ্যায় তেরি তক্‌রির কা
বাত কার তুঝ পর গুমাঁ হোনে লাগা তসবির কা

রাত কেয়া সোয়ে কি বাকি উম্র কি নিঁদ উড় গেয়ি
খোয়াব কেয়া দেখা কি ধড়কা লাগ গেয়ি তাবির কা

জানে তু কিস আলম মে বিছ্ড়া হ্যায় কি তেরে ব্‌গ্যায়ের
আজ তক হর লফ্‌য ফরিয়াদি হ্যায় মেরি তেহরির কা

জিস তরহে বাদাল কা সায়া পেয়াস ভারাকতা রহে
ম্যায় নে ও আলম ভি দেখা হ্যায় তেরি তসবির কা

ইসক মে সর ফোড়না ভি কেয়া কে য়ে বেমেহের লোগ
জুয়ে খুঁ কো নাম দেতে হ্যায় জুয়ে শির কা

জিস কো ভি চাহা উসে শিদ্দাত্‌ সে চাহা হ্যায় ফায়ায
সিল্‌সিলা টুটা নেহি দর্দ কি যন্‌যির কা

অমার সমস্ত বিস্ময় সেই কবে থেকে তোমার কথার জন্য অধীর হয়ে আছে
কথা বলে তোমার সাথে, ছবি বলে প্রবঞ্চিত হচ্ছি আমি

কেন যে রাতে চোখ বুজে এলো, সারা জীবনের ঘুম ফেরারি হয়ে গেল
এ কেমন স্বপ্ন দেখলাম, যাকে সত্য বানানোর পাগলামি পেয়ে বসলো

কি জানি, কোন সে কেমন ক্ষণে তুমি হারিয়ে গেলে, তোমায় না পেয়ে
আজও প্রতিটি শব্দ আমার প্রতিটি অক্ষরের কাছে অভিযোগী

মেঘের ছায়া যেমন করে তৃষ্ণা বাড়িয়ে চলে
তোমার ছবির সেই অদ্ভুত জগতও দেখেছি আমি

প্রেমে মস্তক বিদীর্ণ করে কি হবে, এই নির্দয় মানুষেরা
রক্তের স্রোতকে শির নদীর প্রবাহ নাম দেয়

যাকে চেয়েছে একবার বড় যন্ত্রণাতেও তাকে চেয়ে গেছে ফারায
বেদনার শৃঙখলের পরম্পরা রেখেছে অটুট

হাথ উঠ্‌ঠে হ্যায় মাগার লব্‌ পে দুআ কোঈ নেহি
কি ইবাদত ভি ও জিস কি জাযা কোঈ নেহি

য়ে ভি ওয়াক্ত্‌ আনা থা আব তো গোশ হর আওয়ায হ্যায়
অওর মেরে বর্বাদে দিল মে সাদা কোঈ নেহি

আ কে আব তস্‌লিম কর লেঁ তু নেহি তো ম্যায় স্‌হি
কওন মানেগা কে হাম মে বেওয়াফা কোঈ নেহি

ওয়াক্ত্‌ নে খাক উড়ায়ি হ্যায় কে দিল কে দশ্‌ত সে
কাফিলে গুজারে হ্যায় ফির ভি নকশে পা কোঈ নেহি

খুদ কো য়ুঁ মেহসুর্‌ কর ব্যায়ঠা হু আপনি যাত মে
মনযিলে চারো তরফ হ্যায় রাস্‌তা কোঈ নেহি

ক্যায়সে রাস্‌তো সে চলে অওর কিস জাগা পহুঁচে ফারায
য়া হুজুমে দোস্তাঁ থা সাথ য়া কোঈ নেহি

দু হাত তুলেছি আমি, কিন্তু ঠোঁটে কোন প্রার্থনা নেই
এমনই বন্দনা আমার যার কোন প্রতিদান নেই

এমনও সময় এলো, প্রতিটি শ্রবণ ধ্বনির আকাঙ্ক্ষায় পিপাসার্ত
আর আমার উদভ্রান্ত হৃদয়ে এখন অসীম নীরবতা

চলো এবার মেনে নিই হয় তুমি নয়তো আমি
আমাদের কেউ বিশ্বাসঘাতি নই—একথা কেউ কি মানবে!

এমন কালের ধুলো উড়লো হৃদয়ের বিরাণ মরুতে
কাফেলা পার হয়ে গেছে, কোনও পদচিহ্ন নেই

আমার আমি দিয়ে নিজেকে ঘিরেছি এমন
চারদিকে গন্তব্য দেখি, কোথাও পথ নেই

কেমন পথে চলে এ কোথায় এলে ফারায
কখনো বন্ধুদের ভীড় চারিদিক, কখনো সঙ্গীহীন

জিস সিমত্‌ ভি দেখুঁ নযর আতা হ্যায় কে তুম হো
এ্যায় জানে জাহাঁ য়ে কোঈ তুমসা হ্যায় কি তুম হো

য়ে খোয়াব হ্যায় খুশবু হ্যায় কে ঝোঁকা হ্যায় কে পল হ্যায়
য়ে ধুন্দ্‌ হ্যায় বাদল হ্যায় কে সায়া হ্যায় কে তুম হো

ইস দিল কি সাআত মে কাঈ রঙ্গ্‌ হ্যায় লর্‌যা
ম্যায় হুঁ কে কোঈ অওর হ্যায় দুনিয়া হ্যায় কে তুম হো

দেখো য়ে কিসি অওর কি আঁখে হ্যায় কে মেরি
দেখুঁ য়ে কিসি অওর কা চেহরা হ্যায় কে তুম হো

য়ে উম্র গুরেযাঁ কাহিঁ ঠেহরে তো য়ে জানুঁ
হর সাঁস মে মুঝ কো য়ে লাগতা হ্যায় কে তুম হো

আবাদ হাম আশুফ্‌তা সরো সে নেহি মক্‌তল
য়ে রস্‌ম আভি শেহের মে যিন্দা হ্যায় কে তুম হো

এ্যায় জানে ফারায ইতনি ভি তওফিক কিসে থি
হাম কো গমে হস্‌তি ভি গাওয়ারা হ্যায় কে তুম হো

যে দিকে তাকাই দেখি, একি! এ যে তুমি!
ও প্রাণেশ্বরী একি তোমার মত কেউ, না কি তুমি!

একি স্বপ্ন, একি সুগন্ধ, সে কি মৃদু বাতাস নাকি টুকরো সময়
একি মায়া, মেঘ, একি শ্যামল ছায়া না কি তুমি!

এই হৃদয়ের মুহূর্তগুলোতে দুলে উঠেছে কিছু রং
একি আমি না অন্য কেউ, একি পৃথিবী না কি তুমি!

দেখো তো একি আমার না অন্য কারোর চোখ
দেখি তো একি অন্য কারোর মুখ, না কি তুমি!

এই চঞ্চল আয়ু যদি থামে তবেই হয়তো বুঝবো
প্রতি নিশ্বাসে আমার মনে হয়—একি তুমি!

আমরা ক্ষ্যাপাদের নিয়ে কি এই ফাঁসি কাঠ এমন আবাদ?
এই প্রথা এই নগরে বেঁচে আছে প্রিয়, কারণ তুমি আছো!

ও ফারাযের প্রাণ! এতটা সামর্থ ছিল কার
আমি তো অস্তিত্বের বেদনাও সয়ে নিয়েছি—তুমি আছো!

খামোশ হো কিউ দাদে জাফা কিউঁ নেহি দেতে
বিস্‌মিল হো তো কাতিল কো দুআ কিউঁ নেহি দেতে

বেহশত কা সবব্ রওয়ানে যিন্দাঁ তো নেহি হ্যায়
মেহের ও মাহ্ ও আনজুম কো বুঝা কিঁউ নেহি দেতে

ইক য়ে ভি তো আন্দাযে ইলাজে গমে জাঁ হ্যায়
এ্যায় চারাগারো দর্দ বাড়া কিঁউ নেহি দেতে

মুন্‌সিফ হো আগার তুম তো কাব্ ইনসাফ কয়োগে
মুজ্‌রিম হ্যায় আগার হাম তো সাযা কিউ নেহি দেতে

রেহ্‌যান হো তো হাযির হ্যায় মাতায়ে দিল ও জাঁ ভি
রাহ্‌বার হো তো মন্‌যিল কা পাতা কিউ নেহি দেতে

কেয়া বিত্ গেয়ি আব কে ফারায এহলে চমন পর
য়ারানে কফস্ মুঝ কো স্‌দা কিউ নেহি দেতে

নিশ্চুপ কেন! বিশ্বাস ভঙ্গের সাধুবাদ কেন নেই মুখে
মুমূর্ষু যদি তুমি তবে ঘাতককে আশির্বচন শোনাচ্ছো না কেন!

কারাগারের ঘুলঘুলি—এই অপবাদের দায় তার তো নয়
চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র—সব নিভিয়ে দাও না কেন!

প্রাণস্পর্শী বেদনা প্রতিকারের এও তো এক পথ
উপায়চারী বন্ধুরা, ব্যথা বাড়িয়ে তুলছো না কেন!

বিচারক যদি তুমি, কবে ন্যায্যতার ফরমান হবে!
অপরাধী যদি আমি, তবে সাজা দিচ্ছনা কেন!

পথদস্যু যদি, তবে নাও এই যে প্রাণ ও হৃদয়ের সম্পদ
পথদ্রষ্টা যদি তুমি, গন্তব্যের পথ বলে দিচ্ছ না কেন!

ফুলবাগানের বন্ধুরা কি জানি কেমন কঠিন কাল কাটালো এবার
ফারায, খাঁচায় বন্দি বন্ধুরা আর ডাক দিয়ে যায় না কেন!

তু পাস ভি হো তো দিল বেকারার আপনা হ্যায়
কে হামকো তেরা নেহি ইন্‌তেযার আপনা হ্যায়

মিলে কোঈ ভি তেরা যিক্র্‌  ছেড় দেতা হ্যায়
কে জেয়সে সারা জাহাঁ রায্‌দার আপনা হ্যায়

ও দুর হো তো বাজা তর্‌কে দোস্‌তি কা খায়াল
ও সামনে হো তো কব ইখ্‌তিয়ার আপনা হ্যায়

যামানে ভর কে দুখোঁ কো লাগা লিয়া দিল সে
ইস আস্‌রে পে কে ইক গম্‌গুসার আপনা হ্যায়

ফারায রাহাতে জাঁ ভি ওহি হ্যায় কেয়া কিযে
ও জিস কে হাথ সে সিনা ফিগার আপনা হ্যায়

তুমি সঙ্গে আছো তবু অধীর আমার হৃদয়
এতো তোমার নয়, আমার নিজেরই জন্য নিজের অপেক্ষা

যারই দেখা মেলে, অমনি তোমার কথা
যেন পুরো জগত আমার রহস্যভাগী

যতক্ষণ সে দূরে, ছেড়ে আসার কথা ভাবি
সে যখন পাশে—আমি আর ভাবতে পারি কই!

জগৎব্যাপী দুঃখ আলিঙ্গন করে নিয়েছি
ভরসা ছিল মনে, সেই দুঃখহারী আমার আপন

ফারায আমার প্রশান্তি তো সেই, কি করি আমি
সেই যার হাতে আমার বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে

বেহশতে দিল সিলায়ে আবলা পায়ি লে লে
মুঝসে য়া রব মেরে লফ্‌যো কি কামাঈ লে লে

আক্‌ল হর বার দিখাঈ থি জ্বলে হাত আপনে
দিল নে হর বার কাহা আগ পরায়ি লে লে

ম্যায় তো উসি সুব্‌হে দরখ্‌শাঁ কো তবঙ্গার জানুঁ
জো মেরে শেহের সে কাশ্‌কোলে গ্‌দায়ি লে লে

তু গনি হ্যায় মাগার ইতনি হ্যায় শরিয়্যাত মেরি
য়ে মোহাব্বাত জো হামে রাস্‌ না আয়ি লে লে

আপনে দিওয়ান কো গলিয়ো মে লিয়ে ফিরতা হুঁ
হ্যায় কোঈ হুনারে যখ্‌মে নুমাঈ লে লে?

বিস্রস্ত হৃদয়, পথ ভ্রমণের পুরস্কার এই পায়ের ক্ষত নিয়ে নাও
আমার কাছ হতে হে ঈশ্বর, আমার শব্দের উপার্জন নিয়ে যাও

বুদ্ধি বার বার দেখিয়েছে আপন দগ্ধ হাত
বার বার হৃদয় বলেছে—অপরের আগুন হাতে তুলে নাও

আমি তো সেই আলোকময় ভোর কে ঋদ্ধ বলে মানি
যে আমার শহরের হাত থেকে অন্ধকারের ভিক্ষাপাত্র তুলে নেয়

তুমি প্রাচুর্যময়, আমার এইটুকুই শুধু শর্ত
যে ভালোবাসা সইলো না আমার, ফিরিয়ে নাও তাকে

নিজের কবিতার বই গলি গলি নিয়ে ঘুরি
আপন ক্ষত প্রদর্শনের এ আশ্চর্য কৌশল—কেউ কি নেবে

সিলসিলে তোড় গ্যায়া ও সভি জাতে জাতে
ওয়ার্না ইতনা তো মারাসিম্ থে কে আতে জাতে

শিক্ওয়ায়ে যুল্মাতে শ্ব সে তো কাঁহি বেহতর থা
আপনে হিস্সে কি কোঈ শাম্মে জ্বালাতে জাতে

কিতনা আসাঁ থা তেরে হিজ্র মে মর্না জানা
ফির ভি ইক উম্র লাগি জান সে জাতে জাতে

জশ্নে মক্তল হি না বরপা হুয়া ওয়ারনা হাম ভি
পা বাজওলা হি সহি নাচতে গাতে যাতে

উস কি ও জানে উসে পাসে ওয়াফা থা কে নেহি
তুম ফারায আপনে তরফ্সে তো নিভাতে জাতে

যেতে যেতে সব পরম্পরা ছিন্ন করে গেল সে
নইলে আসা যাওয়ার মত অতটুকু সম্পর্ক তো ছিল

রাতের অন্ধকার নিয়ে অনুযোগের চেয়ে তো অনেক ভাল হত
নিজের ভাগে যে প্রদীপ—সেটাই জ্বালিয়ে যেতে

কত সহজ ছিল তোমার বিরহকালে মরে যাওয়া
তবু এ জীবন ফুরোতে একটা জীবন কেটে গেল

বধ্যভূমিতে উৎসবই শুরু হল না এবার, নয়তো—
পা ক্ষত-বিক্ষত হোক, নেচে গেয়ে শামিল হতাম

কতটা সংযোগ ছিল তার বিশ্বাসের সাথে—সে জানে নিজের খবর
ফারায, তুমি তোমার পক্ষ থেকে তো রক্ষা করে যেতে পারতে

করুঁ না য়াদ আগার কিস তরেহ্ ভুলাউঁ উসে
গজল বাহানা করু অওর গুনগুনাঁউ উসে

*স্মরণ না করি যদি কি করে ভুলবো তাকে!*
*এই গজল বাহানা করে তাকেই গুনগুন করে গাই*

ম্যায় খুদকো ভুল চুকা থা মাগার জাঁহাওয়ালে
উদাস্ ছোড় গ্যায়ে আঈনা দিখাকে মুসে

*আমি তো নিজেকে ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এই জগতজনেরা*
*আয়না দেখিয়ে আমায় উদাস করে তোলে*

ঢুন্ড্তা ফিরতা হু লোগো মে শাবাহাত্ উসকি
কে খোয়াব মে আয়ে ভি ও তো খায়ালো জ্যায়সে

*সবার মুখে শুধু তার মুখ খুঁজে ফিরি*
*সে যে স্বপ্নেও কল্পনা হয়ে আসে*

য়ে রায্ নারায়ে মনসুর হি সে হাম পে খুলা
কে চৌবে মিম্বারে মসজিদ সলিবে শেহের ভি হ্যায়

*মনসুরের নিনাদ থেকেই এই রহস্য বুঝলাম আমি*
*মসজিদের মিম্বরের কোনও শহরের বধ্যভূমি বটে*



ইকবাল আর ফয়েজ আহমদ ফয়েজের পর এক নিশ্বাস বিরতিতেই আহমদ ফারাযের স্থান। নিরেট সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার কালে এত বড় কবির জন্ম বিস্ময়কর। তৎকালিন ভারতের নওসেহরাতে ১৯৩১ সালে, পাঠান পরিবারে জন্ম। কিশোর ফারায ১৯৪৭ সালে মহারাজার বিরুদ্ধে কাশ্মিরিদের প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক নির্ভীক ফারায কারারুদ্ধ হয়েছেন, হারিয়েছেন জীবিকা ও বসত, নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতা। জীবনকে ভালবেসে ফেলার এই অপরাধ সংক্রমিত করে গেছেন সমকালের উর্দু কবিতায়। উর্দু কবিতার সহজাত রোমান্টিকতার সঙ্গে বিপ্লবী উপলব্ধির সংযোগের ধারাবাহিকতায় ফারায ছিলেন প্রবাদপ্রতিম জনমানুষপ্রিয় কবি। মানুষের দুঃখ-দৈন্য, পরাজয়, হতাশা আর সামগ্রিকভাবে এসবকে জয় করে নেয়ার সম্ভাবনার অন্তরতম দিক, তার রাষ্ট্র ও সমাজপ্রেক্ষিত কবিতা আর নিজ জীবনে প্রকাশ করে অগণিত মানুষের ভালবাসা পেয়ে ২৫ আগষ্ট ২০০৮ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে গত হন।

কুঁড়েঘর প্রকাশনা

9 843000 033019